অস্তিত্ব

আশাপূর্ণা দেবী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মন্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

শ্রীরণেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেনগুপ্ত
স্নেহাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত
লেখিকার অন্য বই

বাছাই গল্প
আমি ও আপনারা
জরিপ
যে যেখানে ছিল
অফুরন্ত
প্রতীক্ষার বাগান

অস্তিত্ব

প্রথম পর্ব

উত্তর-মধ্য কলকাতায় দুশো আড়াইশো বছরের পুরনো বাড়ি দুর্লভ নয়, কে জানে তার থেকে বেশী বয়েসেরও আছে কিনা। তবে তারা তো 'বাড়ি' নয়, প্রাসাদ। পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'রাজপ্রাসাদ'।

বড় বড় রাস্তায় বুকের উপর, অথবা নেহাৎই সরু সংকীর্ণ গলির বক্ষপঞ্জরের খাঁজে খাঁজে অনেকখানি অনেকখানি জমি জুড়ে অবস্থিত রাজা মহারাজদের সেই সব বিশালদেহী প্রাসাদদের বার্ধক্যজীর্ণ পতনোন্মুখ অথবা অর্ধপতিত অথচ আভিজাত্য গম্ভীর চেহারা, আজকের পথচারী দর্শককে একটা দার্শনিক নিঃশ্বাস না ফেলিয়ে ছাড়ে না।

হয়তো এই অকারণ বিস্মৃতি, অকারণ বাহুল্য, আর অহেতুক কারুকার্যের ঘটা প্রাসাদ-পতিদের বেপরোয়া অপচয়ের নমুনাই দাখিল করে, তবু তার অন্তরালে একটা ফুরিয়ে যাওয়া কালের সমারোহের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে এক একটি প্রতি-পত্তিশালী বিরাট পুরুষের অথবা এক একটি প্রতিষ্ঠাখ্যাত পরিবারের জীবনসাধনা, কল্পনাসম্পদ, শিল্পবোধ, রুচিবোধ, সৌন্দর্যস্পৃহা আর দরাজ দিলের ইতিহাস।

কিন্তু এটা কী?

উত্তর কলকাতার একটি নামী-দামী অঞ্চল, অধুনা অধিকতর দামী, দু দুটো বড় রাস্তার কর্ণার প্লটে যে বার্ধক্যজীর্ণ শোভাসৌন্দর্যহীন একতলা বাড়িখানা তার পলেস্তারা খসা সেকেলে আধলা ইঁটে গাঁথা দেহখানা নিয়ে, ততোধিক জীর্ণ—দীর্ঘ ঘেরা প্রাচীরের মধ্যে অনেকখানি বেহিসাবি জমির বুকজুড়ে বোকার মতো হুমড়ে বসে আছে তার দিকে তাকালে কি পথচারীর দার্শনিক নিঃশ্বাস পড়ে ? পড়ে না। পড়বার কথাও নয়!

বাড়িটা তো বর্তমান মালিকের সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন। তাই পথচারী-দর্শক এই ভাঙা-ইটের পাঁচিল ঘেরা অনেকখানি গাছ-আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়ো পোড়ো জমির মাঝখানে বসে থাকা কুদর্শন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মালিকের মুখ্যুমির সমালোচনা করতে করতে চলে যায়।

বছরের পর বছর কী লোকসানটাই খাচ্ছে লোকটা। অবশ্য সব লোক আবার চলেও যায় না—জমি কেনা বেচার দালালশ্রেণীর লোক তো সর্বত্রই ঘোরে, যেমন ঘোরে জীবন-বীমার দালালরা। তারা জানে তাদের নাছোড়বান্দা চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হবেই। এখানেও কিছু কিছু জমির দালাল তাই ভেবে শক্তি ভটচায্যির এই

মাটির মাটি নিয়েছিল, কিন্তু শক্তি ভটচায্যির শক্তির কাছে তারা হার মেনে বিদায় নিয়েছে। তবে একেবারে কি বিদায় নিয়েছে? তারা আর না আসুক তাদের স্বজাতির তো অভাব নেই? এখনো আসে দালাল-টালাল, এই জমিটার অর্ধাংশ বেচেও যে তিনি জীবনের হাল এবং বাড়ির ভোল ফিরিয়ে ফেলতে পারেন, তা বিশদ বোঝাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগে, কিন্তু শেষ ফল একই।

প্রথমদিকে অনেকে ভাবতো লোকটা তার জ্ঞাতিদের মতো অল্প দাঁও মারার প্রলোভনে না ভুলে বেশী দাঁও মারার তালে আছে, এখন আর তা ভাবে না। শেষ পর্যন্ত ভাবে লোকটা পাগল। কিন্তু সেকথা শুধু কি সুযোগ সন্ধানী দালালের দল অথবা জমি সন্ধানী ভদ্রলোকেব দলরাই ভাবে? শক্তি ভটচায্যির আত্মীয়স্বজন? জ্ঞাতি পরিজন? স্ত্রী পুত্র?

ভাববেই তো।

এই ভটচায্যি বংশের অনেক ভটচায্যি তো তাদের নিজ নিজ অংশের সোনারখনি তুল্য জমি বেচে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ চড়া দামে ঘরবাড়ি সমেত জমি বেচে দিয়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে সুখে বসতি করেছে। জ্ঞাতির আওতা ত্যাগ করে, কেউ কেউ বা কিছুটা রেখে কিছুটা বেচে, সেই টাকায় তিনচারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি বানিয়ে বাড়িওয়ালা বনে গিয়ে রাজার হালে আছে। আছে। কারণ তাদের বুদ্ধি আছে।

আর বুদ্ধিহীন শক্তি ভটচায্যি? আযৌবন যেন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে করেই চলেছেন। ঘরে বাইরে।

শুনতে পাওয়া যায় একদা এই ভটচায্যি বংশের এক পণ্ডিত পুরুষ (শক্তি ভটচায্যির প্রপিতামহ না বৃদ্ধপ্রপিতামহ কে জানে) তারা ভটচায্য যখন ভাগ্যান্বেষণে নবদ্বীপ থেকে চলে এসে কলকাতায় এই অঞ্চলে ধুলোর দামে অনেক বিঘে জঙ্গলে জমি সংগ্রহ করে নিয়ে আর তার মাঝমধ্যিখানে একখানা খড়ের চাল মাটির দেওয়ালের বাসা বানিয়ে ফেলে একটা টোল খুলে বসেছিলেন, তখন নাকি এখানের আশে পাশে বাঘ ডাকতো।

শহরের উন্নতি আর বিস্তৃতির চাপে, সেই বাঘেরা অবশ্য অচিরেই বাপ বাপ ডাক ছেড়ে গভীর গহনে পলায়ন করেছিল, কারণ শুধু যে বাঘই মানুষের ভীতিকর তা তো নয়, মানুষও বাঘেদের কাছে যথেষ্ট ভীতিকর। সে যাক, বাঘেরা কিম্বদন্তী রেখে চলে গেল। বন কেটে বসতের কাজ দ্রুত এগোতে লাগল, তারা ভটচায্যির টোলেরও বোলবালাও ঘটালো। মাটির বাড়ি ভেঙে দালান বাড়ি উঠল, 'ভটচায্যির টোল' এ অঞ্চলে রাস্তার একটা নিশানা হয়ে পড়ল।

প্রথমদিকে পণ্ডিত সাহস করে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে আসতে পারেন নি, দেশের সংসারে গ্রামের সমাজে নিন্দে উঠবে বলে। কিন্তু ছোট ছোট বাড়ি অনেকগুলো বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। প্রধানত আশ্রিত প্রতিপাল্যদের জন্যেই অবশ্য টোলের ছাত্ররা, যারা দূর থেকে এসেছে শিক্ষার্থী হয়ে তারা কোথায় থাকতে যাবে পণ্ডিতমশাইয়ের আশ্রয়ে ছাড়া ?…দেশ থেকেও তো নিয়ে আসছেন হরদম ! জ্ঞাতিদের ছেলে ভাগ্নে ভাইপো শালীপো শালাপো, পড়শীর আত্মীয়, আত্মীয়ের আত্মীয় সবাইয়ের অবারিত দ্বার তারা ভটচায্যির বাড়ি !

সবাই যে টোলে পড়তে এসেছে তাও নয়, নতুন কলকাতার অদৃশ্য হাতছানিতে সম্মোহিত উঠতি তরুণরা আর উদ্যমী যুবকেরা ধরে পড়েছে, একটা মানুষের মতো মানুষকে।…মানুষটাও সেই ধরে পড়ার মর্যাদা রেখেছেন, মুঠো মুঠো ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

ক্রমে নিজের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠল। তখন সাহসও বেড়েছে কিছু। মেয়ে ক'টাকে বিয়ে দিয়ে পরগোত্র করে ফেলে, ছেলেগুলোকে নিয়ে চলে এলেন তারা-ভূষণ নিজের কাছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সংখ্যায় তো নেহাৎ কম নয় তারা, চার মেয়ে ছয় ছেলে। অবশ্য তখন এটা ভয়ঙ্কর একটা সংখ্যা বলে গণ্য হতো না। তারাভূষণ নিজে তো তেরো ভাইবোনের একজন। সে যাক—শেষ মেয়েটাকে ছ বছরেই বিয়ে দিয়ে ফেলে তারাভূষণ যখন ছেলেদের নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে শিক্ষাদীক্ষা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, নেহাৎ ছেলেগুলোর ভাতজলের জন্যেই তাদের মাকেও কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। তখন সংসারের মহিলাকুল আড়ালে আবডালে ফোঁস ফোঁস করলেও পুরুষজনেদের কাছ থেকে খুব বেশী বাধা পেলেন না তিনি। তাছাড়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের কাছে অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত এই ছেলেকে বাপ দাদা, কাকা জ্যাঠারা একটু সমীহর চোখেই দেখতেন।

সেকালের হিসেবে—

প্রায় প্রৌঢ়া চল্লিশ বছরের সুরধুনী দেবী পতিদেবতার এই সদ্বিবেচনায় অন্তরালে তাঁর পা পুজো করলেও, বাইরে অপছন্দ ভাব দেখিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, 'পণ্ডিত মনিষ্যির ই কী উটকো খ্যায়াল ! আমি এই বড় বয়েসে নাচতে নাচতে সেই মেলেচ্ছর দেশে ছুটব ? জাত জন্ম থাকবে কিছু ?'

কথাটা তারাভূষণের খুড়ির মুখ কহিত হয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। তারাভূষণ মনে মনে হেসে, মুখে বললেন, 'তালে তো ছোট খুড়ি, ধরে নিতে হয় আমারও জাত পাত নেই।'

খুড়িই ঝাঁট ঝাঁট দিয়ে উত্তরটা দিলেন, 'ও মা ! ভাসুরপোর এক কতা ! বেটাছেলের

হলগে, আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ্। শাস্তরের যত বিদেন তো মেয়েছেলের জন্যেই।'
বাড়ির মধ্যে সেজবৌমাটিই হচ্ছে সবচেয়ে কাজের আবার সবচেয়ে জাহ্নে শুহ্নে ঘরের মেয়েও বটে, অন্য আর বৌরা তার কড়ে আঙুলের তুল্যও নয়। কাজেই খুড়ির আশা যদি সেজবৌমার অনিচ্ছের খবর ভাসুরপোকে এই অন্যায় ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত করতে পারে।

কিন্তু ভাসুরপোর মধ্যে নিবৃত্ত হবার চিহ্ন ধরা পড়ল না। তিনি হাস্যবদনে বললেন, 'কলকাতাটা যে "মেলেচ্ছ দেশ" এ খবর কে দিয়েছে খুড়ি তোমাদের বৌকে? দেশটা কি অগঙ্গার? আমার ওখানের নিকট কাছেই তো বাগবাজারের ঘাট!'

অতএব খুড়ির আশা ফলবতী হলো না।

সুরধুনী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে—পুঁটলি-পাটলা ঝাঁপি-চুপড়ি গুছিয়ে, ছয় ছেলেকে আঁচলে বেঁধে হনিমুনে যাত্রা করলেন।

পতির সঙ্গে পিতৃগৃহ থেকে প্রথম আসা, সেই যা একটুকরো রোমাঞ্চকর স্মৃতি ছিল জীবনে। অতঃপর তো আসা যাওয়া চলেছে ভাগ্নে ভাসুরপো অথবা বাপভাইয়ের সঙ্গে। নবদ্বীপ থেকে পাটুলি, দূরত্বটাও তো ভীতিকর নয়। নৌকোয় চড়ে বসতেই যা দেরী।

সুরধুনীর বিদায়কালে ঘাটে ভীড় জমল কম নয়, অন্তঃপুরিকারা কেঁদে ভাসালেন, সুরধুনীও কেঁদে গঙ্গা বওয়ালেন বৈকি। সেটা কৃত্রিম নয়। চিরকালের শিকড় ছেঁড়া! তারপর কলকাতায় এসে তাঁর অনভ্যস্ত নবজীবনের যাত্রা শুরু; সে তো আলাদা একটা ইতিহাস। দেশের বাড়িতে দায়িত্বের ভাগ নেবার লোক ছিল, এখানে সম্পূর্ণ একা। এবং দেখলেন কেবলমাত্র ছয়টি ছেলের জননীর ভূমিকা পালন করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবার প্রশ্ন ওঠে না। আশ্রমজননীর ভূমিকা নিতে হচ্ছে তাঁকে।

সেকালের মজবুত হাড়, আর মজবুত বনেদের শিক্ষা, সুরধুনী দেবীকে এ গৌরবের ভূমিকায় সসম্মানেই উত্তীর্ণ করেছিল। তারাভূষণও নববলে বলীয়ান হয়ে টোল-বাড়ির এবং বিষয় সম্পত্তির উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়েছেন। কিন্তু এসব তো আর ইতিহাসে স্বাক্ষর রাখার মতো ঘটনা নয়।

ছয় ছেলের নামে নামে ছটা আর মেয়েরা আসবে যাবে বলে তাদের নামকরে একটা এই সাত সাতখানা বাড়ি তিনি বানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে তো নিতান্তই বাড়ি মাত্র। নেহাৎই বাসগৃহ কাঠের গরাদে দেওয়া ছোট ছোট জানলাদার, লম্বা মানুষকে মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়, এমন দরজা সম্বলিত একতলা। একতলা সেই দালান বাড়িগুলির না ছিল ছিরি না ছিল ছাঁদ। রাস্তার পরিকল্পনাই বা কী? বিঘে

দশেক জমি ছিল দখলে, তারই মাঝখানে মাঝখানে এক একটা বসিয়ে দেওয়া। বাকি জমিতে টানা লম্বা গোয়ালের চালী, রাজমিস্ত্রীদের মালমশলার স্তূপ যেখানে সেখানে যাহোক গাছ। এই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে জঙ্গল সাফ করা হয়েছে এইমাত্র। বৃক্ষরোপণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

কালক্রমে পটপরিবর্তন হতে থাকল দ্রুত, সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই অঞ্চল, একদা যেখানটায় মাত্র সাপ্তাহিক হাট বসতো, সেখানে—রীতিমত দৈনিক বাজার বসে গেছে। আর বর্তমানে তো দুবেলা সমান তালে। রাস্তা গড়ে উঠেছে বিশাল চওড়া চওড়া।

তারা ভটচায্যির ছয় ছেলের সন্তান-সন্ততিকুল যতদিন পেরেছে পিতামহের আমলের সেই বাড়িতে বাস করেছে, তার পরের ইতিহাস তো আগেই বলা হয়েছে।

শহরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে বেড়েছে এ অঞ্চলের নাম আর দাম। এবং বুদ্ধিমানেরা সেই নামদামের সুযোগ হাতছাড়া করে নি।...

কীভাবে কলকাতার অনেক জায়গার মতোই বিঘের দামে কাঠা, আর সেই কাঠার দামেও ইঞ্চিখানেক জমি বিক্রী হয়েছে, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শহরতলিতে এখনো তো চলছে সেই ঘটনা।

ভটচায্যিদের জমি সবচেয়ে বড় লাফ্ দিয়েছিল, যখন তার একটা পাশের রাস্তা দিয়ে বাসচলাচল করতে শুরু করল। আর অবিশ্বাস্য লাফ্ মারল, যখন সামনের রাস্তায় ট্রামলাইন পাতার তোড়জোড় দেখা গেল।

অবশ্য সেও আজকের কথা নয়। তারপর অঞ্চলটার চেহারা আমূল বদলে গেছে। শুধু ভটচায্যির টোলবাড়ির শেষ চিহ্ন বহন করে বোকার মতো বসে আছে কর্ণার প্লটের ওই পোড়ো জমি আর ভাঙা বাড়িটা।

তারাভূষণের বড়ছেলে ভক্তিভূষণ টোলটা চালিয়েছিল কোনোরকমে। ভক্তিভূষণের একমাত্র ছেলে ওদিক দিয়ে যায় নি। সে সায়েবের আপিসে চাকরী করেছে। এবং অতঃপর বংশের ধারাই পালটে গেছে। শক্তিভূষণও তো একটা সওদাগরি অফিসে এক কলমে জীবন কাটিয়ে এখন রিটায়ার করে বসে আছেন।

নামের 'ভূষণ' ধরে ধরেই যা বংশধারার গতিচিহ্ন। যে কোনো নামের শেষে যুক্ত থাকা চাই একটি 'ভূষণ'। তা সে তাতে মনে থাকুক না থাকুক।

কিন্তু অঞ্চলটার নাম? নামটা অনুক্ত থাকলে, ক্ষতি কী? আচ্ছা না হয় ধরে নেওয়া যাক—'টিয়া বাগান'।

কলকাতা শহরবাসীরা যে 'বাগান' শব্দটার প্রতি নিতান্তই অনুরক্ত তা শহরের রাস্তার নামটামের দিকে লক্ষ্য পড়লেই তো বেশ ধরা পড়ে। না হলে—'হাতী'

'সিংহীর' মতো ভয়াবহ জীব থেকে শুরু করে চোরকেও বাগানের বলয়ে আবদ্ধ রাখতে কল্পনা তৎপর হয় ?'

আর ফলটলের কথা তো বাদই দাও। নামী ফলেরা তো আছেনই, কলা, পেয়ারা আতা, ফল্‌সা, লেবু্ এরাও তো জাতে উঠেছে কলকাতার রসিক সমাজের কল্যাণে পাখী পক্ষীরাও ঢুকে পড়েছে বৈ কি সে দরবারে। টিয়াও ঢুকলো না হয়। অতএব টিয়াবাগান।

'টিয়াবাগান বাজার' এখন কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকটি বাজারের একটি। যেখানে শক্তি ভটচায্যি একটু বেলার দিকে, ভীড়ভাট্টা কমলে, ফুটোয় কাগজ গোঁজা ছেঁড়া চটের থলিটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজার করেন। ছেলেরা বাজার করতে চায় না, মা বললে বলে, বাবার মনের মতো বাজার করার উপযুক্ত এলেম আমাদের নেই 'মাদার'। মাপ করো।

ছোটছেলে তৃপ্তিভূষণ, ডাকনাম যার তিপু, এবং ওই নামেই যে পাড়ায় বিখ্যাত, সে আবার মেজ দাদা দীপ্তিভূষণের থেকে এককাঠি বাড়িয়ে বলে, বাজার করতে গিয়ে যদি টু পাইস পকেটে না এলো, ফরনাথিং খেটে মরি কেন জননী ? বাবা তো শেষ পাইটির অবধি হিসেব চাইবে।

কথাটা শেফালীকে আর কষ্ট করে স্বামীর কাছে পেশ করতে হয় না, আশপাশ থেকে কানে যায়ই শক্তি ভটচায্যের। তিনি কোনো মন্তব্য করেন না, রাগ বিরক্তিও বোঝা যায় না। তালি মারা জুতোজোড়াটি পায়ে গলিয়ে নিজ সময়মত থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তালিহীন জুতো কবে পরেন শক্তি তা কারো মনে থাকে না।

বড়ছেলে শান্তি যখন চাকরীতে ঢুকেছিল, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই মায়ের জন্যে একটা কোরা লালপাড় শাড়ি, আর বাবার জন্যে পুরোপুরি একটা পোষাক সেটাই কিনে এনেছিল। একখানা ধোওয়া ধুতি, একটা টু ইন শার্ট, একটা গেঞ্জি এবং একজোড়া জুতো।

শক্তিভূষণ তখনো সার্ভিসে, তবে ছাড়ার সময় ঘনিয়ে আসবো আসবো। সওদাগরী অফিস বলেই গড়িমসি চলছে।

জুতো ?

শক্তিভূষণ প্রথমেই জুতোটায় চোখ ফেলে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'পয়লা রোজগারে' বাপকে জুতো ? তা ভালো।'

শেফালী রেগে উঠেছিলেন, এ আবার কী কথার ছিরি তোমার? জামা-কাপড় গেঞ্জি জুতো সবই তো এনেছে। আপিস যাবার একটা সেট্।

শক্তিভূষণ আরো সূক্ষ্ম হাসি হেসেছিলেন, সেটাও তো একরকম জুতোই। অফিসের

খাতায় তো কালের ঘণ্টা বেজে এসেছে। এখন নতুন জুতো জামা? শান্তি ঘর থেকে উঠে গিয়েছিল।

শেফালী তীব্র হয়েছিলেন, ছেলেটা আহ্লাদ করে বাপের নাম করে উপহার আনলো আর তুমি এইরকম করলে? মনে একটু বাজলো না? আশ্চর্য! সামনের সোমবার থেকে পরবে এসব, বলে রাখছি।

শক্তিভূষণ বললেন, বললাম তো শেষ বাজারে জাঁক দেখাতে যাবার শখ নেই। পুরনোই চলুক এ কটা দিন।

ঠিক আছে বাড়িতেই পোরো। রিটায়ার করলেই তো আর তুমি গেরুয়া ধরবে না।

কী ধরবো বলা যায় না। তবে জীবন কাটল ছ টাকা ন টাকার জুতো পরে, এখন আর মরণকালে বত্রিশ টাকার জুতো পরতে বাসনা নেই, শান্তিকে বোলে দিও দোকানে যদি দাম ফেরৎ না দেয়, বদ্‌লে ওর নিজেরই একজোড়া জুতো কিনে নেয় যেন।

ওকে তো তুমি চাকরীতে ইণ্টারভিউ যেতে নতুন জুতো কিনে দিয়েছ। এক্ষুনি কী দরকার?

শক্তিভূষণ হেসে উঠেছিলেন, আরে ছি ছি। সে আবার জুতো! সাড়ে চোদ্দ টাকা দাম।

বড়ছেলের উপহার পর্ব সেইখানেই ইতি।

তারপর তো ইতিহাস অনেকটা গড়িয়ে গেছে।

বিবাহিত শান্তিভূষণ এখন স্ত্রী পুত্র নিয়ে আসানসোলে থাকে। রেলের চাকরী, বদলীর ঘটনা ঘটে মাঝে মাঝে। ছুটিছাটাতে কখনো রেলের পাশে ভ্রমণে যায়। কখনো বাড়ি আসে। এলে বৌ থাকতে যায় বাপের বাড়ি, শান্তি এখানে থাকে বটে, তবে অধিকাংশ দিনই ওবাড়িতে নেমন্তন্ন থাকে। তাদেরও যে একটা মাত্র জামাই। সাধ আহ্লাদ থাকবে না?

শেফালী আক্ষেপের অভিযোগ তোলে, সারের সার বড় ছেলেটাকে তুমি ইচ্ছে করে পর করে দিলে।

'পর' কেউ কাউকে করে দিতে পারে না। সে যাক্ 'সারের সার' কেন? ঘুষেতে মাইনেতে অনেক টাকা উপায় করে বলে?

ঘুষ? ঘুষ নেয় শান্তি?

মাইনের বহর জানলে, আর আচার আচরণ দেখলে সেই সন্দেহই মনে আসে আর কি। তা তোমার আক্ষেপ কিসে? তোমার কাছ থেকে তো 'পর' হয়ে যায় নি?

তোমায় তো যখন তখনই বৌয়ের হাত দিয়ে ভালো ভালো জরিটরিদার শাড়ি প্রণামী দেয়।

তোমার সব কথাই বাঁকা। বৌয়ের হাত দিয়ে আবার কী! বৌমা মেয়েছেলে, শাড়িটাড়ি বোঝে ভালো, নিজে দোকান বাজার যায়, পছন্দ করে কেনে, হাতে করে আনে। এতে দোষটা কী হলো?

নাঃ দোষের আর কী?

বলে শক্তিভূষণ হয়তো শাবলখানা হাতে নিয়ে উঠোনে নামেন মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে। বাড়ির আশেপাশের জমিটা এখন বেশ কিছু কাজে লাগিয়েছেন শক্তিভূষণ। যে সব স্থায়ী গাছগুলো ছিল, যেমন দু একটা কুল গাছ পেয়ারা গাছ গোঁড়া লেবুর গাছ নিষ্ফলা একটা সুপুরি গাছ আর ফলন্ত নারকেল গাছ তাদেরই ধারে কাছে, শাক বোনেন শক্তিভূষণ, নটে পালং। এদিকে ওদিকে পোঁতেন লাউ, কুমড়ো, কাঁকুড়, উচ্ছে, সীম, কাঁচালঙ্কার গাছ।

রিটায়ার করার পর প্রথম খুব উৎসাহ করে বলেছিলেন সবাই মিলে হাত লাগালে এই জমিটাকেই কীচেন গার্ডেন বানিয়ে ফেলে, আমাদের সম্বৎসরের তরকারি চচ্চড়ির ভাবনা মেটানো যায়। কী বলিস রে? আলু বাদে কী না ফলানো যায়, বল? চাকুরে বড ছেলেকে বলেন নি, বলেছিলেন স্কুল ছাত্র মেজ ছোট ছেলে, আর অবিবাহিতা মেজ সেজ ছোট তিন মেয়েকে। বড মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন নিজে চাকরিতে থাকতে থাকতেই।

কিন্তু প্রস্তাবে খুব উৎসাহ দেখালেও, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল হাত লাগাতে কোনো হাতই বড এগিয়ে আসছে না। মেজ মেয়ে বিভা বলল, সামনের দিকটায় ফুল বাগান করা হোক না বাবা। আমি আলাদা করে যত্ন করবো।

ওই পর্যন্তই।

কারণ তার মেজদা দীপ্তিভূষণ যেই মুখ বাঁকিয়ে বলল, ওই খোঁদো পাঁচিল, আর এই পচা বাড়ির সামনে ফুল বাগান!

সেই মন ঘুরে গেল বিভার।

সত্যি কী শ্রীহীন নির্লজ্জ নিরাবরণ দৈন্যের সাক্ষ্যবাহী তাদের এই বাড়িটা! ইস্কুলের বন্ধুরা এসে ঢুকলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

তারা হয়তো কখনো বলে, তোদের বাড়িতে কতগুলো ঘর রে বাবা! কত দালান রোয়াক প্যাসেজ। মাথা গুলিয়ে যায়।

কিন্তু সেই বলার মধ্যে সুখস্বাদ পাবার কিছু নেই।

একগাদা ঘরই আছে। সাজানো গোছানো আছে?

কলকাতা শহরে, এই টিয়াবাগানের মতো পাড়ায় কেউ কল্পনা করতে পারে এক এক খানা বড় বড় ঘর পড়ে আছে সাবেক কালের ভাঙা চোরা বড় বড় তক্তাপোষ, বেঞ্চ সেলফে ভর্তি হয়ে, ভর্তি হয়ে জ্বালানি কাঠ ঘুঁটে নারকেল পাতা, শুকনো ডাল-পালায়।

রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটা তো শুধু শুধুই পড়ে আছে।

একদা ওর নাম ছিল নাকি 'কুটনোর ঘর।'

কারণ ভটচায্যি বংশধরেরা আলাদা আলাদা বাড়িতে বসবাস করলেও, রান্না খাওয়ার মূল কেন্দ্র ছিল এই টোল বাড়িটা। এখানের মতো বিরাট দরদালান ছ'-সাতটা বাড়ির আর কোনোটায় ছিল না। এটাই পড়েছে শক্তিভূষণের ভাগে।

আব যেটাকে বলা হয় ভাঁড়ার ঘর।

সেটা দেখলে তো বিভার প্রাণ হাঁপিয়ে আসে।

'উঁচু সাঙা' না কি তার উপর ঝুল ধুলোয় ভর্তি কত কত ইয়া ইয়া হাঁড়ি কলসী সাজানো। মাটিতে ইঁটের থাক সাজিয়ে কতগুলো বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ছাতাপড়া জালা বারকোষ বৃহৎ বৃহৎ বঁটি কুরুনী। বিরাট বিরাট দুটো কড়া ছিল, তাইতে না কি মায়ের দিদি শাশুড়ী রান্না করতো আর দুধ জ্বাল দিতো। সেই কড়া দুটো তবু মা কাজে লাগিয়েছে সাবান কাচবার সময় কাপড় সেদ্ধ করতে, আর মাড় লাগাতে। বাড়িতেই তো সব করে নেয় মা। ঠিকে ঝিটা আলাদা পয়সা নিয়ে কেচে দিয়ে যায়, এই পর্যন্ত।

কিন্তু ওই ভাঁড়ার? এই সব অবান্তর জঞ্জালে ভর্তি ঘর দালানগুলো? বিভার সদ্য-ফোটা কিশোরী মনকে যেন জাঁতায় পিষে মারে। মাঝে মাঝে মাকে বলে সে—এই সমস্ত জঞ্জাল একধার থেকে রাস্তায় ফেলে দিতে পার না মা? ওই সব হাঁড়ি-কলসী জালা ড্রাম টিন, কাঠের থালা, মানুষ কাটতে পারা যাবার মতো বঁটি, নাড়াতে পারা যায় না এমন শিলনোড়া—

শেফালী বেজার মুখে বলেন, ওই মাল রাস্তায়? ফেলতে গেলে রাস্তা নোংরা করছ করছ বলে পুলিশে ধরবে।

আহা। মজুর ডেকে জঞ্জাল সাফ করে না লোকে?

তা হলে বলগে তোদের ওপরওলাকে। তার মা ঠাকুমার হাতের সাজানো সংসারকে জঞ্জাল বলে মজুর ডেকে পয়সা খরচ করে ফেলে দেবার পরামর্শ দিগে।

সাজানো! আহা কী সাজানো। ভেবে ঠিক করতে পারা যায় না এতো মোটা রুচি হয় কী করে মানুষের।

একথা অবশ্য বলতে পারে বিভা।

কারণ তার জীবনে সে কখনো তেমন বৃহৎ সংসার দেখে নি যেখানে এই মোটা রুচির জিনিসগুলোই অপরিহার্য। তার দেখার জগতে তো ভাঁড়ার মানে সাপ্তাহিক রেশন ? আর নেহাৎ ফুরিয়ে গেলে তবে এক কিলো আধ কিলো করে আনা তেল দালদা, ডাল গুড়। আর পানের খিলির সাইজের কাগজের মোড়কে মৌরী পাঁচ ফোড়ন জিরে সর্ষে।

উঁচুতে তোলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি কলসীর গায়ে যদি বাটা হলুদে আঙুল চুবিয়ে লেখা থাকে 'মরিচ', 'জিরে', 'সরষে', 'মৌরী', 'মেথি', তাহলে গা কেমন করবে না এদের ?

এই সব মালকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তুলে রাখতে হবে। অসহ্য।

কিন্তু উপায় কী ?

বহুবিধ অসহ্যকে সহ্য করে এই ভাঙা ইঁটের পরিমণ্ডলে পড়ে থেকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে ভটচায্যি বাড়ির কটা উঠতি বয়েসের ছেলে মেয়েকে।

সব থেকে অসহ্য এই যে, নিরুপায় নয়, তবু নিরুপায়ের ভূমিকা।

বাড়ির বড়ছেলেটা একদা উঠতি বয়েস হতে না হতেই মনে মনে যে সুন্দর ছিমছাম আধুনিক বাড়িখানির স্বপ্ন দেখেছে, একটা খাতা বেঁধে তাতে তার প্ল্যান এবং বহির্দৃশ্য এঁকে এঁকে পাতা বোঝাই করেছে। সে বাড়ির কোন্ ঘরটা কার হবে, আর সে সব ঘর কী দিয়ে সাজানো হবে তা পর্যন্ত তার খাতায় মজুত।

আবার অঙ্ক কষে কষে দেখেও রেখেছে, এই কুদর্শন বাড়িটা উড়িয়ে দিয়ে জমিটার বারো আনা অংশ বেচে ফেলে, বাকী চার আনার মধ্যে ওই বাড়িটা বানিয়ে ফেলেও কত টাকা হাতে মজুত থাকে।...সেই মজুত টাকা দিয়ে সে যখন মনে মনে একটা ফ্রীজ কিনে ফেলে কলকাতায় সদ্য আগত টি ভির ব্যাপারে স্বপ্ন দেখছে, তখন মন গেল ঘুরে।

এবং তার পরই, চেষ্টা করে কবে বদলী হয়ে বউ আর সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে কলকাতা ছাড়ল। তার মানে পরিকল্পনাও ছাড়ল।

কী করবে, যদি বাড়ি সম্পত্তির মালিক বলে বসেন, 'আমার বাপ ঠাকুর্দার জিনিস নিয়ে তোমাদের এতো মাথা ব্যথা কেন বাবা ? যতদিন না মরছি আমায় একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দাও—' তা হলে আর কে সেখানে তিষ্ঠোতে চায় ? মান সম্মানবোধ কার নেই ?

তার বউও তো জানাচ্ছে সে প্রতিক্ষণ অপমানের মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু যার যাই হোক, শেফালীর মতো যন্ত্রণা আর কার ? যে শেফালীকে আজীবন একটা ভেঙে যাওয়া বৃহৎ জাহাজের টুকরো টাকরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে গুছিয়ে সংসার

করতে হয়েছে হচ্ছে।

শেফালী জীবনে কখনো তার নিজস্ব সংসারের জন্যে দুটো-একটা ছোটোখাটো হালকা বাসন কিনতে পায় নি। শেফালীর সংসারে স্টেনলেশস্টীলের পদার্পণ ঘটে নি এখনো।

কখনো কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শক্তি ভটচায্যি ভুরু কুঁচকে বলেছেন, বাসন, কেন সিন্দুকেরও বাসন কি সব চুরি গেছে?

শুধু শখের জন্যে? আশ্চর্য! এই সব ভারী ভারী কাঁসা পেতলের বাসন তো সংসারের একটা সম্পত্তি একটা ঐশ্বর্য কটা বাড়িতে আছে?

শেফালীর হাত-পা বাঁধা, শেফালী পড়ে মার খায়, কিন্তু মুখ বুজে অবশ্যই নয়। শেফালীর মুখে মুখে জবাব সাজানো শেফালী বলে উঠেছে—

ছিল সকল বাড়িতেই। ভিখিরির ঘর ছাড়া পুরনো মাল আর কোন্ গেরস্তবাড়িতে না থেকেছে। এখনকার কালে কে আবার সেই ভারী বোঝা টেনে মরে? সেকালের মতন গতরই বা কার আছে? সবাই সাবেকী বাসন বেচে বেচে, আজকালকার মতন কিনে কেটে নিয়েছে। চোখের সামনেই তো দেখলাম বসে বসে।

তা দেখেছে বইকি শেফালী। তার চোখের সামনে দিয়েই তো ভটচায্যি বংশের ভোলা বদলালো। প্রথমে ভিতরে ভিতরে, তারপর আমূল। কত বাসনওলাকেই জ্ঞাতিদের বাড়িতে আসতে দেখেছে সে। পুরুষরা তার সমর্থক।

অথচ শেফালী চিরবঞ্চিত।

পৃথিবীর কোনো লোভনীয় বস্তুর দিকে চোখ তুলে চাইবারও অধিকার নেই তার। কারণ তার স্বামীর রোজগার কম, তারা গরীব। সেই গরীবিয়ানা দিনে দিনে আরো বেড়েই চলেছে। চলবেই, কারণ বাজার দরও তো বেড়েই চলেছে। আর সেই স্বল্প রোজগারও এখন শূন্যের অঙ্কে।

কিন্তু কেন?

কেন শেফালী এমন চিরবঞ্চিতের ভূমিকায় পড়ে আছে?

ভাগ্য?

নাঃ। ভাগ্য কখনোই নয়। শুধু একটা নিষ্ঠুর আত্মসর্বস্ব জেদি একগুঁয়ে লোকের খেয়াল।

ছেলেরা দিন গুনছে কবে তারা 'দিন' পাবে!

মেয়েরা দিন গুনছে কবে তারা 'দিন' পাবে!

কিন্তু শেফালী কিসের দিন গুনবে?

শেফালী লোড্‌শেডিং হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় কেরোসিনের কুপী জ্বেলে রাঁধতে রাঁধতে

প্রতীক্ষা করে রাত কেটে যাওয়া পরদিনের। অন্ধকারে সব এলোমেলো করে রাখতে হয়। সকালের আলো ফুটলে আবার সব গোছানো যাবে।

শেফালীর কাছে সেটাই দিন।

এবেলার জন্যে ওবেলা, সকালের জন্যে রাত্রে আর রাত্রের জন্যে সকালে গুছিয়ে রাখা, এইটাই তো শেফালীর জীবন। আর কোন্ জীবনের সন্ধান সে পেয়েছে?

লোড্ শেডিং তার বড় অসুবিধে ঘটায়।

কাজের চাকার ছন্দ ভঙ্গ হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

আবার ওই লোড্ শেডিং এ বাড়ির কারো কারো সুবিধেও ঘটায় বই কি। এই যে তিপু এমন রাত করে বাড়ি ফিরছে, এটা তো লোড্ শেডিং বলেই কারো চোখে পড়বে না। অন্ধকারে টুক করে ঢুকে পড়বে। বাড়ির ঘেরা প্রাচীর। যাকে ঘোরালো করে 'বাউণ্ডারি ওয়াল' বলা যায়, তার সামনের দিকে সাবেকি কালের একটা 'লোহা-কাঠের' দরজা আছে বটে, যা নাকি শতবর্ষের রোদ জলেও এখনো টিঁকে আছে, সেটাই তো কখনো খিল পড়ে না। খোলাই পড়ে থাকে। বড়জোর ভেজানো। খিল দেওয়া তো হাস্যকর। পাঁচিলের জায়গায় জায়গায় ইঁট খসে খসে এত ফোকর যে, অনায়াসে তার মধ্যে দিয়েই মানুষ গরু ছাগল পাগল সবাই ঢুকে আসতে পারে। চোরের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। এ বাড়ির চেহারা দেখলে চোরেরও খাটতে ইচ্ছে করবে না। দরজাও তাই বন্ধ হয় না।

অতএব তিপু যথারীতি বেড়িয়ে ফিরে ওর নিজস্ব ফোকরটা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। থাক, অন্ধকারে ডিঙোতে গিয়ে কাজ নেই। যদি হোঁচট খায়। একবার অন্ধকারে বুড়ো আঙুলে বড় চোট লেগেছিল।

কিন্তু দরজা ঠেলতে গিয়ে অবাক হলো তিপু।

বন্ধ করল কে?

এই দরজাটা নিয়ে মাথাব্যথা পড়ল কার?

ওঃ। বোঝা গেছে। বাবা!

তিপু কখন বাড়ি ফিরল তার হিসেব রাখার নতুন কৌশল। প্রথম প্রথম যখন তিপু বিকেলে খেলতে বেরিয়ে তনুদের বাড়ি গিয়ে ওদের আড্ডায় জমে গিয়ে দেরি করে ফিরতো, বাবা এই দরজাটার বাইরে বেরিয়ে এসে পায়চারি করতো। বলতো না কিছু, কিন্তু সেটাই তো আরো দুঃসহ। অতঃপর তিপু বলেছে সে তনুর সঙ্গে এক-সঙ্গে পড়তে যায়, তখন বাবা সে পদ্ধতিটা ছেড়েছে। যদিও একবার স্বগতোক্তি করেছিল, 'বড়লোকের বাড়ি ঘন ঘন যাবার দরকার কী বুঝি না।'

স্বগতোক্তির জবাব দেওয়া চলে না, তাই তিপু মাকে উদ্দেশ করে জোর জোর গলায়

বলেছিল, ওরা তো আমাদের আপনার লোক। ওখানে যেতে কী? কত ভালবাসে সবাই আমাকে। তন্নুর মা তো কত দুঃখ করে বলেন, তোমার মায়ের কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয় তিপু। আমাদের তো দু ভাইয়ের ভাগ ছিল, তোমার বাবা তো এক ছেলে। বরং নিজের ভাই বোন বলতে কেউ নেই। ইচ্ছে করলেই কত ভালো ভাবে থাকতে পারতেন।

শেফালী তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে বলে, চুপ বাবা, চুপ কর। ওই মানুষের কানে গেলে এখন অপমানে খান খান হবে।

তিপু যে তার কানে যাওয়াবার জন্যেই বলছে, তা কি আর মা বোঝে না? তবু এও বোঝে মা ভয় পায়। তা ছাড়া অন্যরা মাকে মায়া মমতা করছে এটাও মা পছন্দ করে না সে কথা ছেলেবেলা থেকেই বোঝে তিপু। মা নিজে রাগ করে চেঁচায় 'যেদিকে দু' চোখ যাবে, চলে যাবো—' বলে বাবাকে শাসায়, কিন্তু আর কেউ বললে চটে যায়।

যাক—

বাবার তা হলে এ এক নতুন চাল।

ঠিক আছে।

সমস্ত রাত বাড়ি পাহারা দিক বাবা, তিপু নিজ অভ্যস্ত পথে ঢুকে পড়ে সোজা মায়ের কাছে রান্নাঘরে গিয়ে, 'ভীষণ খিদে' বলে খেতে বসে যাবে। যদিও ভীষণ খিদের প্রমাণ দেওয়া শক্ত। তন্নুর মা যা জোর করে ভালো ভালো সব খাইয়ে দেন। ওদের বাড়ি রোজই ভালো ভালো খাবার। এতো সব রান্না জানেনও। তা সে সত্বেও তন্নুদের অরুচি। খেতে বললেই 'বাপরে মারে' করে। তিপু খেতে পারে, খেয়ে খুশী হয়, এটা তন্নুর মার খুব ভালো লাগে।

কী সুন্দর দেখতে তন্নুর মা।

কী সুন্দর সাজানো গোছানো ওদের বাড়িটা। দেখলে আনন্দ আসে। আর তন্নুর ছোট বোনটা, মিনু। কেমন চালাক চতুর হাসি খুশী। ওর সঙ্গে তন্নুরা (তন্নু আর তার দাদা কিনু) খেলে না বলে তিপুকে ধরে পড়ে ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্যে। আর কেবল বলে, তোমাদের বাড়ির ওখানে কত খালি মাঠ, কী দুর্দান্ত ব্যাডমিণ্টন কোর্ট বানানো যায়, অথচ কেমন যে করে রেখেছ।

কেমন যে করে রেখেছে সে কথা তিপু তো হাড়ে হাড়েই জানে। বারো মাসই তিপুদের বাড়িতে নানান জিনিসে উই ধরে, কত সব জিনিস ইঁদুরে কাটে আর-শোলায় কুঁচোয়, সেই সব টেনে এনে এনে খোলা জমিতে রোদে দেওয়া হয়। বাড়ির পিছন দিকটায় যে জায়গা আছে, সেদিকে নাকি বেশি রোদ যায় না। তা

ছাড়া সেখানে তো জায়গা জুড়ে বানিয়ে রাখা হয়েছে চাপড়া চাপড়া ঘুঁটে, গোল্লা গোল্লা কয়লা গু ড়োর গুল।

অতএব 'সদর দরজার' ভেজানো কপাট ঠেলে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে ছেঁড়া চট ইঁদুরে কাটা বিছানা বালিশ, উই ধরা মাদুর শতরঞ্চি। অথচ এর সামনেই বাবার পরম ভক্তির 'মন্দিরটি'। চানটান না করে বাবা ছোঁয় না ওই মন্দির। মাও তাই করে বোধহয়। জানে না তিপু।

আবার— ভেবে মনে মনে হাসে তিপু, বাবা জানে না, তিপু যখন পাঁচিলের ভাঙা পথ দিয়ে ঢোকে, ওই মন্দিরটাকেই আগে ছোঁয় হাত বাড়িয়ে। ইচ্ছে করেই ছোঁয়া, কাছেই পড়ে তো? দরজা থেকে একটু দূর।

এখনও তাই করল তিপু।

ভাঙা হলেও একালের মতো সীমেণ্ট গাঁথুনি পাঁচ ইঞ্চির দেয়াল তো নয়। মাটির গাঁথুনি, ইঁটের-চাপান। সেকালের কাজ, ধারে না কাটুকে, ভারে কাটতো। খুঁড়তে খুঁড়তে শ দুই বছর লেগেছে।

সেই ইঁটের চাপান চওড়াটা ডিঙিয়ে আসতে পরিশ্রম মন্দ হয় না, তবু এটা একটা আমোদ তিপুর। অথবা হয়তো গতানুগতিক পথটাকে পরিত্যাগ করবার মনোভঙ্গীর একটু সূচনা।

এদিকে চলে এসে এবড়ো খেবড়ো জমি ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসতে গিয়ে আর একবার থমকাতে হলো তিপুকে। ও কী? ওরা কে? বাবার সাধের লাউমাচার নীচে?

সাধেরই বলতে হয়, কেউ তো সাহায্য করতে আসে না, পাছে বাবা ডাকে এই ভয়ে বাবাকে তোড়জোড় করে উঠোনে নামতে দেখলেই কেটে পড়ে সবাই। বাবা একাই বাঁশ কেটে দড়ি বেঁধে বানিয়েছে ওটা। ডাকেওনি কাউকে! দারুণ মানী তো! মানীদের ভাগ্যে যা হয়, তাই হয়েছে বাবার, একা হয়ে বসে আছে।

তা যাই হোক, বানিয়েছে তো ভালই। লাউরা যাতে ওর ওপরে ডালপালা মেলে গা গড়িয়ে গড়াগড়ি দিতে পারে তেমন মজবুতও করেছে, তাই বলে ওটা কি বাস স্ট্যাণ্ডের শেড? তাই দু' দুটো মানুষ ওর নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?

শুধু দাঁড়িয়ে আছে বা বলা যায় কী করে? নড়ছে চড়ছে, হাত মুখ নাড়ছে। জ্যোৎস্না না থাক আকাশের একটা আলো থাকে, যেটা শুধু লোড্ শেডিং-এর সময়ই বুঝতে পারা যায়।

তিপু নিথর!

তিপু নিস্পন্দ!

তিপুর বয়েস চোদ্দ ছুঁয়েছে। তিপু তাই দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু আর নার্ভের সমস্ত সূক্ষ্ম টিসুগুলিকে পর্যন্ত একাগ্র করে শুধু চোখের তারা দুটোর মধ্যে সংহত করে দেখতে চেষ্টা করছে ওদের মুখ দুটো কাছাকাছি চলে আসছে কিনা। খুব কাছাকাছি।

কিন্তু তিপু কি শুধু দেখছেই? না প্রতীক্ষা করছে? প্রতীক্ষাই বলতে হয়। তিপু সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতে থাকে জীবনে একবার অন্তত সে একটা ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চ-ময় অবৈধ দৃশ্যের দর্শক হোক।

দেখতে দেখতে স্বল্প আলোকও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিপু এখন দেখতে পাচ্ছে ওই দুটো মানুষের মধ্যে একটা হচ্ছে মেজদি, আর অন্যটা হচ্ছে রেডিওর দোকানের সেই ছেলেটা।…হু। তিপুর অনুমান তা হলে কারেক্ট। তিপুর সন্দেহ অভ্রান্ত। কিছুদিন থেকেই মেজদির অকারণ রেডিওর দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করা দেখেই তিপুর সন্দেহ হয়েছিল। কলেজ যেতে, কলেজ থেকে আসতে, কোনো-না-কোনো সময় চোখে পড়েই যায় তিপুর।

আর মেজদি ওকে হঠাৎ দেখতে পেলেই বাচ্চার মতো আহ্লাদে ভাসা মুখে বলে ওঠে, দোকানটা আজকাল কা অপূর্ব সাজিয়েছে দেখেছিস রে তিপু!

যেন তিপু একটা বাচ্চা, কিছু বোঝে না।

বোঝবার বয়েস হয়েছে কি না জানে না, কিন্তু তিপু যে বোঝে অনেক কিছু তা সে নিজেই টের পায়। স্কুলের বন্ধুরা অবশ্য বলে, 'এটা একটা ন্যাকা খোকা।' সেটা তিপুর চালাকি। তিপু ওদের বদমাইসি বদমাইসি পাকা পাকা কথা সব বুঝতে পারে, তবু অবোধের মতন তাকিয়ে থাকে। কী দরকার বাবা নিজেকে প্রকাশ করবার? একবার প্রকাশ হয়ে গেলেই ওদের দলে মিশে যেতে হবে। সেটা চায় না তিপু। তিপু ওদের মনে মনে ঘেন্না করে।

'নর্থ টাউন হাইস্কুলটা' আবার একটা ইস্কুল! বাজে! বাবা বলে ইস্কুলের আবার ভালো মন্দ কী, ছাত্র ভালো হওয়া নিয়ে কথা। এই ইস্কুলে পড়েই কত কত লোক বড় হয়েছেন। আমরাও তো এইখানেই পড়ে মানুষ হয়েছি। কত দিনের পুরনো ইস্কুল। ঐতিহ্যই আলাদা।

তিপু তা মানে না।

তনুর স্কুলটা কী ভালো।

তনু তিপুর আদর্শ।

যদিও তিপু জানে সে তনুর থেকে অনেক পাকাচোকা ছেলে।

তনু হলে কি এই পরিস্থিতিতে এ রকম অধীর আগ্রহে মাথার চুল খাড়া করে

প্রতীক্ষা করতে থাকতো একটা রোমাঞ্চময় দৃশ্যের আশায় ?

কিন্তু তিপুর প্রতীক্ষা সার্থক হলো না।

তার মানে 'সে সব' তিপু আসার আগেই সারা হয়ে গেছে। তিপু দেখল মাচার নীচে থেকে মাথাটা নীচু করে বেরিয়ে এলো দোকানী সমীর। বেজায় লম্বা তো। এতোক্ষণ ঘাড় মাথা নীচু করেই ছিল তা হলে। বেরিয়ে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে একটু হাসির সঙ্গে বলল, 'তা হলে ওই কথাই রইল।'

তারপর অন্ধকারে এবড়ো খেবড়ো মাটিতে প্রায় হোঁচট খেতে খেতে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজার খিলটা খুলল, বেরিয়ে গিয়ে টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

আর খিল পড়বে না, এটা বুঝে গেছে তিপু। কিন্তু মেজদি মাচার নীচে থেকে বেরোচ্ছে না কেন ? কী করছে ওখানে ? কিছু নিয়ে নাড়ানাড়ি করছে যেন। নির্ঘাৎ ভেঙেছে মাচাটা।

যা লম্বা লোকটা, মাথার ধাক্কা খেয়েই হয়তো—আচ্ছা তিপু যদি এখন চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেজদি, ওখানে কী করছিস ?' বলে।

নাঃ চেঁচিয়ে ওঠাটা বোধহয় সেফ হবে না।

আস্তে আস্তে গিয়ে যদি—

এ কী ! অ্যাঁ !

মেজদির ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল কোথা থেকে তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো। দু সেকেণ্ডও ভাবতে হলো না, কোথা থেকে এলো বোঝাই গেল আলো ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গেই যে শব্দক্ষেপ করা হয়েছে, কে ওখানে !

চিরভয়ঙ্কর, চির বিরক্তিকর সেই গলা ! গম্ভীর ধাতব ভারী।

আবার হঠাৎ তিপু অবিশ্বাস্যভাবে নিজের গলাটা শুনতে পেল। তিপু জানে না সে কখন কথা কয়ে উঠল, কিন্তু পেল শুনতে, আমি ! তিপু !

তিপু ! তুমি ওখানে কী করছো ?

কিছু না ! এমনি ! অন্ধকারে আসতে আসতে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে —বোধহয় তোমার এই সব লাউটাউ পড়ে গেছে। তুলতে পারছি না।

যা পড়ে গেছে থাক—

টর্চ হাতে বেরিয়ে এলো বাবা, বলল, রাত্রে গাছে হাত দেওয়া নিষিদ্ধ, চলে এসো।

আর কী করবে তিপু ? আর কী করতে পারে ? চলে এলো। শক্তি ভটচায আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। বললেন না, এতো রাত্তিরে ফিরলে তা হলে ?

এইতেই আরো বাবার ওপর রাগ আসে তিপুর। কেন, জিগ্যেস করলে কী হয় ?

সেটা করলে তো কৈফিয়ত দেবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। বলতে পারা যায়, সামনে পরীক্ষা, এখন পড়া-টড়া বেশী।

তবু কথা চালাবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করতে তিপু বাবার পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলে, এমন বিচ্ছিরি করলাম। খুব বোধহয় ভেঙে গেছে।

ভেবেছিল বাবা বোধহয় উত্তর দেবে না।

সেই রকমই তো অহঙ্কার মহাশয় ব্যক্তিটির। কেউ কথা বললে যে তার একটা উত্তর দেওয়া সভ্য রীতি, এটা উনি আদৌ মানেন না। ইচ্ছে হলে দ্যান, ইচ্ছে না হলে দ্যান না। কিসের যে এতো অহঙ্কার তা জানে না তিপু।

অহঙ্কার করবার আছে কী?

মনে মনে ভাবতে পারো বটে তুমি তিন চার লাখ টাকার মালিক, কিন্তু তাতে লাভটা কী? লাভটা কী? অবস্থা তো এই। একটা ছেঁড়া ধুতি, আর একটা ফুটো গেঞ্জি, এই তো সর্বদার সাজ। খাচ্ছো যা, তাও তো এক্ষুনি গিয়েই দেখতে পাওয়া যাবে।

ইয়া বড় ইয়া ভারী একখানা কাঁসা না কিসের যেন থালায় মোটা মোটা কটা রুটি, আর খানিকটা ল্যাবড়া তরকারি। বাটিতে কী? না, একটু ডাল। মাছ নয়, মাংস নয়, দুধ নয়. ভালো ভালো তরকারি নয়, মস্ত একটা বাটিতে একটু খালি ডাল।

মা যখন এক এক সময় রাগ করে বলে, কিসের জন্যে যে এই বড় বড় থালা বাসন টেনে মরি! রান্নার ছিরি তো এই। সেকালে কর্তারা সাত ব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাত খেতেন, মানাতো এ থালা।

সে সময় বাবা কথার উত্তর দেয়। বলে, বেমানান মনে হয় তুলে রেখো ওগুলো। বাজার থেকে মাটির খুরি আর শালপাতা এনে দেবো।

মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলে, তাতে তোমার অনর্থক বাজে খরচ হবে না?

বাবা অনায়াসে বলে, তেমনি বাসন মাজা লোকের খরচটা তো বেঁচে যাবে।

বেঁচে যাবে। ওঃ সুখদাকে ছাড়িয়ে দেবে?

বাঃ! বাসনই যদি না থাকলো, বাসন মাজা লোকের দরকারটা কী? পাতা খুরি তো নিজেরাই ফেলে দেওয়া যায়।

মা সহ্য করে চলে সব, কিন্তু চেঁচাতে ছাড়ে না। একথা শুনে মায়ের গলার শব্দ আকাশে ওঠে, ওঃ! শুধু পাতা ফেললেই হবে আর কোনো কাজ নেই সংসারে?

বাবা আরো অবলীলায় আর আরো ধাতব গলায় উত্তর দেয়, তার জন্যে তো সংসারের লোকেদের ভগবানের দেওয়া হাত-পাগুলোও আছে। তখন তো আবার তা হলে সেগুলো অকেজো হয়ে গিয়ে অনর্থক বেমানান লাগতে পারে।

মা প্রায় ধেই ধেই করে নেচে উঠে বলে, শুনলি ? শুনলি তোরা ? ছাখ্‌, এবার কী মানুষ নিয়ে ঘর করে এলাম আমি।
মায়ের চুলের গিঁঠ খুলে যায়, গায়ের আঁচল লুটিয়ে যায়, চোখে আগুন ঠিকরোয়।
তবু আবার পরদিন দেখতে পাওয়া যায় সারি সারি ভারী ভারী পীঁড়ি পেতে, আর বড় বড় থালা সাজিয়ে সবাইকে খেতে দিচ্ছে মা। পাতের পাশে হুন লেবুটিও দিতে ভোলে নি। লেবুগুলো বাড়ির গাছের তাই। কিনে খেতে হলে নিশ্চয়ই এ ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারতো না মা।
এই তো ক্যাপাসিটি, শ্রীশক্তিভূষণ ভট্টাচার্যের।
তবু কিসের এতো অহমিকা !
যখন ছেঁড়া চটের থলি হাতে বাজার নিয়ে আসে, তখনও মুখের ভাব দেখো। যেন পৃথিবীটা ওঁর নস্যি। উনি যেন কোন উচ্চলোকের জীব।
এসব কথা মনে উদয় হয়, আর বাবার ওপর রাগ বেড়ে যায় তিপুর। কিন্তু এখনো তিপু্‌ মেজদার মতো বাবাকে তাচ্ছিল্য দেখাতে অভ্যস্ত হয় নি। ওই আর একটি। মেজদা।

বাবার কার্বন কপি।
এরও যেন সারা শরীর দিয়ে নিজের সম্পর্কে অহমিকা, আর অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য ঝরে ঝরে পড়ছে।
তিপুর যে বাবার ওপর এতো রাগ, তবু ভয়ও তো করে। আর মেজদা ? 'বাবা' নামের যে একটা মানুষ বাড়িতে আছে, সে কথা যেন তার গ্রাহ্যের মধ্যেই নেই। গ্রাহ্য অবশ্য কারো সম্পর্কেই নেই দীপুর।
ওর চালচলন দেখলে মনে হয়, ও যেন এ বাড়ির কেউ নয়। যেন প্রয়োজনে পড়ে কোনো অনাত্মীয় বাড়িতে খেতে থাকতে হচ্ছে। তাই সেই খাওয়া থাকাটা যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে চেষ্টা করে। কলেজে পড়ে, অথচ বাবার কাছ থেকে কোনো খরচা নেয় না। কোথা থেকে জোগাড় করে কে জানে। ভালো ভালো জামা জুতোও তো পরে। গুনতিতে অবশ্য বেশী নয়, তবু জিনিসগুলো দামী। ধোবা খরচ লাগে না, ইস্ত্রীর দরকার হয় না। নিজেই সাবান কেচে ঝুলিয়ে দেয়, নিজেই এক সময় তুলে নেয়। ওর ঘর আলাদা, গামছা তোয়ালে আলাদা, তেল সাবান আলাদা। সবই কিছু কিঞ্চিৎ স্পেশাল।
হয়তো টিউশনা ফিউশনী করে। জিগ্যেস করতে গেলে এমন একখানা উত্তর দেয়, যে অতি বেহায়াও আর দুবার বলতে পারবে না। মায়ের মতো বেহায়া লোক ও নয়।

মা তাই আড়ালে বলে, জানি না—কোনো বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর হয়েছে, না ঘর-জামাই হতে স্বীকার পেয়েছে।

বাবার সঙ্গে দীপুর বাক্যালাপ আছে কিনা মনে পড়ে না তিপুর। কিন্তু তিপু দীপুর মতো শক্ত বুক নয়, তিপু তাই বাবার ওপর যত রাগই থাক, সেধে সেধে কথা বলতে যায়। উত্তর যে পায় সব সময় তাও নয়, পেলে কৃতার্থই হয়।

এখনও অবশ্য পাবে নাই ভেবেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই উত্তরটা এলো।

বাবা চলতে চলতে ঘাড় না ফিরিয়েই বলে উঠল, সবই তো ভেঙে যাচ্ছে! ওই তুচ্ছটা নিয়ে আর আপশোস করে কী হবে।

সেই তাচ্ছিল্য মিশ্রিত ধাতব স্বর।

সবই ভেঙে যাচ্ছে।

কেঁপে উঠল তিপু।

তবে কি মেজদির ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বাবা?⋯তার মানে তিপুর চালাকিটাও?

ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে তিপু।

লোড শেডিং-এর এও একটা সুবিধে। সব সময় সব গতিবিধিটা সকলের চোখে পড়ে না।

তিপুর হাতের একটা জোর চিমটি খেয়ে অনেকটা পিছু হটে অন্ধকারে গা মিলিয়ে মিলিয়ে বিভা যখন বাড়ির পিছন দিকের উঠোন দিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে বসে পড়ল, তখন ওর বুকের ওঠাপড়াটা কেউ দেখতে পেল না তাই রক্ষে।⋯ আলো থাকলে—নির্ঘাৎ মার চোখে পড়তো, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতো, ওখানে অমন বসে পড়লি যে হঠাৎ? হাঁপাচ্ছিস বা কেন? কোথায় ছিলি এতোক্ষণ?

অতএব বলা যায় লোড শেডিং অনেক সময় কারো কারো উপকারীও।

আস্তে এক সময় নিঃশব্দে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিভাও।

ঘর এ বাড়িতে অনেক বটে, কিন্তু সকলের আলাদা আলাদা ঘর, এমন মনোভঙ্গী নেই এ সংসারের—দীপুই যা আলাদা ঘরের মানুষ।

আর অবশ্য বাড়ির কর্তা।

বাকি ক'জন এই একটা ঘরেই।

একটা বৃহৎ তক্তপোষে মা বিভা আর ছোট বোন খুকু, অন্য আর একখানা ছোট চৌকীতে তিপু।

তিপু অবশ্য ইচ্ছে করলে দীপুর মতো—স্বাবলম্বী হতে পারতো, কিন্তু ওর আবার ভূতের ভয় আছে। একবার বলেছিল, আমি এবার থেকে—তোর এই ঘরটায়

শোবো মেজদা। মায়ের ঘরে শুলে পড়া হয় না।

দীপুর প্রকাণ্ড ঘর, অসুবিধের কিছু নেই।

ভাবে নি যে দীপু বলে উঠবে, বাড়িতে আরো অনেক ঘর আছে।

বাঃ তোর এ ঘরেই তো কত জায়গা।

অতএব বলার কিছু নেই।

না, আমার অসুবিধে হবে।

তিপু অতএব মাতৃস্নেহক্রোড়ে।

ভূতের ভয় দূর না হওয়া পর্যন্ত থাকতেই হবে এই অবস্থায়।

তিপু অন্ধকারেই টের পেল, মেজদি ঘরে ঢুকলো, শুয়ে পড়লো। মেজদি টের পায় নি আমি ঘরে আছি। কিন্তু তিপুও চট করে মেজদি বলে ডেকে উঠতে পাচ্ছে না। যেন তিপুই কী একটা লজ্জার কাজ করে বসেছে। অথচ এই সময়ই যা মেজদির সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে। একটু পরেই তো মা খেতে ডাকবে। আর খাওয়ার পর খুকুটি এসে জুটবে। পাকার ধাড়ি মেয়ে, যেটি শুনবে মনে গেঁথে রাখবে আর কোনো এক সময়ে মার কাছে লাগাবে। তিপু তো জানে হাড়ে হাড়ে।

অথচ মেজদির সঙ্গেই তার যা কিছু কথা।

বাবা মার সমালোচনা (যা নাকি তিপু আর বিভার প্রধান প্রসঙ্গ) নিজেদের অকারণ গরীব হয়ে থাকার দুঃখ, তনুদের বাড়ির গল্প এসব কার কাছে করা যায় মেজদি ছাড়া? মেজদা তো অনেক কথা কান পেতে শোনেই না। নয়তো ঠোঁট বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, থাক থাক ওঁদের কথা তুলতে আসিস না আমার কাছে। মেজাজ ঠিক থাকে না।

মেজদি তবু তিপুকে একটা মানুষ বলে গণ্য করে।...তবে আজকের ঘটনায় যে মেজদি কতোটা কী হয়ে যাবে বুঝতে পারে নি।

মেজদি বলে ডেকে উঠতে না পেরে তিপু হঠাৎ নিজের গায়ে একটা থাপ্পড় মেরে উঠল, উঃ কী মশা।

আর তখনই বিভার গলা পেল, তিপু! তুই এখানে?

তারপর এ চৌকীর ধারে চলে এলো মেজদি। গাঢ় গভীর গলায় বলল, তিপু! তোকে যে আমি কী বলব! গুরুজন না হলে তোর পা পুজো করতাম।

তিপু বলে উঠল, ধ্যাৎ।

বিভা আস্তে বলল, ধ্যাৎ নয় রে। বাবা যদি বুঝতে পারতো, তা হলে—

তিপুও গম্ভীর গলায় বলল, বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছে!

সে কী? তুই তো—ইয়ে আমি তো পিছন দিয়ে—কেন রে? একথা বলছিস কেন?

মনে হলো বাবার ভাবভঙ্গী দেখে।

বিভা একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু টর্চ ফেলার সময়ই তো তুই—কতক্ষণ এসেছিলি রে তুই?

তিপু ইচ্ছে করেই বলল, অ—নেকক্ষণ।

মেজদি একটু ভয় পাক।

ভয়ই পেল বোধহয় বিভা, আস্তে বলল, সাড়া দিসনি যে?

এখন তিপু মিছে কথা বলল, বাঃ আমি কী করে বুঝব কে ওখানে। লক্ষ্য করে করে দেখছিলাম।

বিভা একটু গুম হয়ে থেকে বলে উঠল, আলোটাও যে ঘুচে গেল! তা দেখনি তো কে?

হুঁ!

বিভা আবার একটু গুম হয়ে থেকে বলল, ও বলছিল, ওর কে এক বড়লোক মামা না কাকা কি আছে, সে আমাদের এই জমিটার জন্যে পাগল। বহুৎ দাম দিতে চায়। তাই বলছিল আমি যদি বাবাকে বলে নরম করতে পারি। জানে না তো আমার বাবাটি কী বস্তু।...সত্যি, মানুষ যে এতো বোকা হতে পারে ভাবা যায় না!

তিপু মনে মনে ভাবছিল মেজদি মনে করছে শুধু বড়লোক মামার কথা বলবার জন্যে লোকটা অন্ধকারে আড়াল জায়গা দেখে দাঁড়িয়েছিল এই কথা বিশ্বাস করাবে আমায়। হুঁঃ।

কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করল না, শুধু বলল, 'বোকা' না বিচ্ছু! ইচ্ছে করে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। চিরকাল রাখবে তাই। জানে তো আমরাই ওর হাতে পড়ে আছি।

বাপের সম্পর্কে এহেন মন্তব্য এরা করেই থাকে। আর 'বঞ্চিত' শব্দটা তো আশৈশব মায়ের কাছে শুনে শুনে মুখস্থ। মানেটাও অন্তরস্থ হয়ে গেছে জ্ঞানাবধি। বিভা আবার বলে উঠল, ও বলছিল, এখন নাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে কাঠা। বাবা যদি অন্তত বাড়ির সামনের অংশটাও ছেড়ে দেয় দেড় লাখ টাকা মতো পেয়ে যেতে পারে। ভাবতে পারিস তিপু? আর আমরা ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে একদিন মাত্র মাছ খেতে পাই, কাপড় ছিঁড়ে না গেলে একখানা কাপড় হয় না কলেজের মাইনে চাই যেন চোরের মতো—

ফিরিস্তি হয়তো আরো দিতে থাকতো বিভা, যদি না আবেগ ওর গলাটা টিপে ধরে বাদ সাধতো।

হয়তো দোকানী সমীর বলেছিল এসব কথা, কিন্তু আরও কিছু কি বলে নি? তা সেইটাকে তিপুর মনের চোখ থেকে আড়াল করতেই বিভার এটার উপর জোর দেওয়া। তিপু ভাবুক, মামার হয়ে আর্জি করতেই এসেছিল সমীর।

তিপু সেটা বুঝতে পারবে না এমন নয়। তিপুর বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, যাই বলিস মেজদি, আসলে তুই আসল কথাটা চাপা দিচ্ছিস।

আর বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, মেজদি বাবাকে তো চিনিস, নিজের মরণ ডেকে আনিস নি। দিদির দুর্দশা ভাব!

কিন্তু তিপু এসব কথা বলে নিজের 'পাকা' হয়ে যাওয়াটা প্রকাশ করবে না। তিপু তখন অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ একটা বেচারী মেয়ের ত্রাণকর্তা হয়ে পড়েছিল। এখন আবার সামলে গেছে।

তিপু তাই বলে, কারই বা তা নয়? মা যখন রেশনের টাকা চায়, যেন কত দোষ করছে এই ভাব। দেবো টাকা বাবা, তবু ফি বার একবার করে শোনাবে, সুদের ওই টাকাটা ছাড়া, আমার আর কোনো আয় নেই তা জানো বোধহয়। সরকারি চাকরী ছিল না যে পেন্সন আছে।

কথাটা ঠিক। অফিস থেকে বিদায়কালে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গ্র্যাচুইয়িটি ইত্যাদি লব্ধ টাকাটা শক্তি ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপজিটে রেখে তার সুদ থেকে সংসার চালিয়ে চলেছেন। বড়ছেলে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, নেন না। বলেছেন, থাক, তেমন দরকার হলে চেয়ে নেব। যতদিন চালিয়ে যেতে পারি যাই।

শেফালী আগুন হয়ে বলেছে, তেমন দরকারটা তোমার কবে হবে বলতে পারো? আমি মরলে—ছেরাদ্দর সময়?

শক্তিভূষণ অনায়াসে জবাব দিয়েছিলেন, আরে! সেটা আবার আমার দরকার হলো কিসে? সে তো শান্তিভূষণের মাতৃদায়! সে তার দু'হাতের রোজগারের টাকা এনে দু'হাতে খরচ করে মায়ের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে পারে।

সব সময় তুমি আমার ছেলেকে 'ঘুষ ঘুষ' বলে খোঁটা দাও। তবু বলবো, সে তোমার থেকে ভালো। নিজের আদর্শের মহিমার ধ্বজা তুলে—স্ত্রীপুত্রকে ভিখিরি করে রাখে নি।

ভালোই! তোমার ছেলেমেয়েরা তোমার মনের মতো হচ্ছে, সেটাই মঙ্গল।

শেফালী জ্বলে ওঠে।

আবার তুমি মেয়ের কথা তুলে আমায় ঘা দিচ্ছো? নিষ্ঠুর পাষাণপ্রাণ নির্মায়িক পুরুষ! সর্বসুখে বঞ্চিত মেয়েটা একদিন একটু হাসি আহ্লাদে যোগ দিয়েছিল, তুমি তাঁকে জন্মের শোধ ত্যাগ দিয়ে রাখলে। বাপের প্রাণে এতটুকু মায়া এলো না!

না এলো না ! কী করব বল ! তোমার মতো মায়ার শরীর আমার নয়। অনিষ্টকারী মায়া, আমার মতে বিষতুল্য। সান্নিপাতিকে বিকারে রোগীকে মায়া করে তেঁতুলের আচার আর ভিজে পান্তো দেওয়াটা যেমন মায়া, আমার মতে এও তাই !

ও কিন্তু আর নিজে নাচতে নাচতে থিয়েটার দেখতে যায় নি, ননদ-ননদাই জোর করে নিয়ে গিয়েছিল সর্বদা মনমরা হয়ে থাকে বলে ! শাশুড়ীও 'যাও যাও' করেছে—

তা ভালোই তো। সেই মহৎহৃদয়া শাশুড়ী—আর হিতৈষী আত্মীয়জনেদের কাছেই থাকল। এই নির্দয় নিষ্ঠুর হতভাগা বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার দরকারটা কী ?

আর 'মা' বলে একটা প্রাণী নেই তার ?

অকালে বিধবা হয়ে যাওয়া বড় মেয়ের মুখটা স্মরণ করে প্রাণটা হুহু করে ওঠে শেফালীর। একটা সন্তান পর্যন্ত হয় নি তার যে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। সেই মেয়ে কবে একটা রঙ্গিন শাড়ি পরে থিয়েটার দেখতে এসেছিল, সেটাই বাপ হয়ে ধরে বসে রইলে তুমি ?

সুন্দরী বড়মেয়ে শোভার বর জুটে গিয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। পাত্র পক্ষ যেচে এসে বিনাপণে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পণ চাইলে—তাদের আর আদর্শবাদী শক্তিভূষণের মেয়েকে নিয়ে যেতে হতো না।

শক্তিভূষণের বাড়ির চেহারা দেখে তারা এমন প্রস্তাবেও উদ্যত হয়েছিল, এ পক্ষের খরচটাও তারা করতে প্রস্তুত, শুধু যেন বরযাত্রীদের সম্যক সমারোহময় অভ্যর্থনা হয়। প্রস্তাবের মুখেই হাত জোড় করেছিলেন শক্তিভূষণ, তাহলে আর এই হতভাগা শক্তি ভট্টাচার্যের মেয়ের ভাগ্যে আপনার তিনতলা কোঠায় ওঠা সম্ভব হয় না। গোত্র বদলের আগে পর্যন্ত আমার সমগোত্রই থাকতে হবে আপনার ভাবী পুত্রবধূকে।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে।

অতি ভদ্রলোক বলেই হোক, অথবা মেয়েটাকে অতি পছন্দ হয়ে গেছে বলেই হোক, তিনি আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলেন নি। সামান্য কজন বরযাত্রীকে নিয়ে এসে একটি শ্রীহীন সজ্জাহীন নিষ্প্রভ আসরে ছেলের বিয়েটুকু সমাধা করে ফেলে নিজের বাড়িতে সমারোহের দৃশ্যের আমদানী করেছিলেন। অবশ্য সে দৃশ্যের দর্শক হতে যান নি শক্তিভূষণ, শেফালীর ভাগ্যেও অতএব জোটে নি সেটা।

এক্ষেত্রেও করযোড়ে বিনীত নিবেদন করেছিলেন শক্তিভূষণ, মা বাপের তো যাওয়া চলে না বেয়াই মশাই, বিধি নেই জানেন অবশ্যই।

বেয়াই ইতিমধ্যেই 'বেয়াই' চিনে ফেলেছিলেন, তাই শান্তভাবে বলেছিলেন, 'জানি না' বলব না, আজকাল ওসব কেউ মানে না, সে কথাও বলব না, খাবার জন্যে পীড়া-পীড়িও করব না, শুধু যদি একবার পায়ের ধুলো দিয়ে আশীর্বাদ করে আসেন !

তাহলে সন্ধ্যের সময় গাড়িটা পাঠিয়ে দিই।

শক্তিভূষণ গলা খুলে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, গাড়ি চড়ে কুটুম বাড়িতে শুধু একটু পায়ের ধুলো দিতে যাব, আমাকে এমন তালেবর ব্যক্তি ভেবেছেন নাকি বেয়াইমশাই? না, না, ওসব করতে যাবেন না। আশীর্বাদ আমরা এখানে বসেই করবো। সদা সর্বদাই করছি।

শেফালী সব কথাই দরজার আড়াল থেকে শুনেছে। শেফালীর বিষ নেই কুলোপানা চক্র। বেয়াই চলে যাওয়ার পরক্ষণেই শেফালী কপালটাকে চাপড়ে চাপড়ে লাল করে তুলে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, এতো অহঙ্কার কেন তোমার? এতো অহঙ্কার কেন? মেয়েব শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলছিলে যেন তোমার খাতকের সঙ্গে কথা কইছিলে। নিজে যাবে না যাবে না আমার যাওয়াটা সুদ্ধু পণ্ড করলে কেন শুনি? আমি বলে কত আশা করে—বিধি নেই? নিষেধ আছে। মান্ধাতার আমলের শাস্তর খুলে বসলেন! আজকাল আবার কে মানে ওসব? মা বাপ যাচ্ছে, খাচ্ছে, সবই করছে। তোমারই জ্ঞাতিদের বাড়ি দেখি নি, কনের মা কনের তুল্য সেজে গুজে গিয়ে দিব্যি পংক্তি ভোজনে বসে মাংস মুরগি খেয়ে এলো!

শক্তিভূষণ স্ত্রীর দিকে একটা বহুবর্ণ মিশ্রিত দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বলেছিলেন, ওহো হো। তোমার এসব দেখা আছে বুঝি? জানা ছিল না তো! ঠিক আছে, সাধবাসনাটা মিটিয়েই নাও তাহলে। বলে পাঠাও, কর্তার বলার ভুল হয়েছিল, তিনি যাবেন না, গিন্নী যাবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দিও।

শেফালী আজীবন দেখে চলেছে, তবু শেফালী লোকটার কথার টোন্ সব সময় ধরতে পারে না। তাই বলে ওঠে, আহা! একবার বারণ করে, আবার বলা, ভারী যেন গৌরব।

তাতে কী। বড়লোক বেয়াই বাড়ির ভোজে প্রাণভরে মাংস মুরগী খেয়ে আসবে, সেটা কি কম গৌরব? বাদসাধাটা ঠিক হয় নি আমার! তবে মুস্কিল হচ্ছে কনে সাজবার মালমশলা কিছু আছে কি তোমার?

এই জীবন শেফালীর!

এরপর যদি শেফালী বলে, মেয়ের সুখ ঐশ্বর্য দেখে হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে শক্তিভূষণের। খুব কি দোষ দেওয়া যায় তাকে?

কিন্তু সে সুখ ঐশ্বর্য কদিন আর সইল বেচারী শোভার? কিছুর মধ্যে কিছু না, সামান্য দু'দিনের জ্বরে মারা গেল অমন স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছেলেটা।

শেফালী তখনও কেঁদে কেঁদে বলেছিল, লোকের চোখ লেগে গেল গো। আমার গভের সন্তানের এতো সুখ এত আদর সইবে কেন? দেখে লোকের হিংসেয় বুক

ফেটে যাচ্ছিল সেই আগুনে শোভা আমার পুড়ে মলো।

কিন্তু সেটা কি আর শক্তিভূষণের উদ্দেশ্যে বলেছিল? বলেছিল আত্মীয় স্বজনদের কল্পিত ঈর্ষাতুর মুখ ভেবে। তবে শক্তিভূষণের কান বাঁচিয়ে তো বলে নি।

তা শোভার শ্বশুরবাড়ির লোকরা সত্যিই বড় ভালো। এই দুর্ঘটনায় চিরাচরিত প্রথায় বৌকে 'অপয়া' বলে পিতৃগৃহে নির্বাসন না দিয়ে, বরং 'আহা কী দুঃখিনী!' বলে আরো স্নেহ মমতায় ডুবিয়ে রেখেছে। কী করে তার মন ভালো থাকবে সেই চেষ্টায় তৎপর।

'বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে ইচ্ছে হলেই চলে যেও, কোথাও যদি বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয় বোলো—'

বলে গাড়ি মজুত বাখে।

কিন্তু সে ইচ্ছে কি যখন তখন হয় শোভার? মানে হতো? হতো না। সেটা হলো একটা জমজমাটি আড়ম্বর ঐশ্বর্যের বাড়ি, শোকেও স্তব্ধ হতে জানেন। রাত দিন অভ্যাগত আত্মীয়ের ভিড়! সান্ত্বনা দানের উপলক্ষে এলেও, গালগল্প কথাবার্তার তো কামাই থাকে না? মনের তলায় তলিয়ে গভীর গম্ভীর হবার সময়ই পায় না বেচারী তরুণী সদ্যবিধবা।

সেখানের তুলনায় এই বাইশ নম্বর টিয়াবাগান? প্রভাহীন, দীপ্তিহীন, বিলাস সুখহীন! নাঃ আসতে ইচ্ছে হয় না।

সেই ভয়ঙ্কর 'ঘৃণ্য সত্যটা' একদিন ধরা পড়ে গেল শক্তিভূষণেরই চোখে।

কলকাতা শহরের সব থেকে নামী আর পুরনো থিয়েটার বাড়ি দুটো তো টিয়াবাগান বাজারেরই সন্নিকটে। কোনো এক রবিবারের ম্যাটিনী শো ভাঙার সময় কোনো এক প্রয়োজনে শক্তিভূষণ একটা থিয়েটারের গেট-এর সামনা সামনি গিয়ে পড়েছিলেন, দেখতে পেলেন জনা কয়েক সাজে-সজ্জায় উজ্জ্বল, হাস্যে কথায় মুখর তরুণীর মধ্যমণি রূপে শোভা বেরিয়ে আসছে। পিছনে এক সুবেশ সুকান্তি যুবক। শোভার কিছু সাজ সজ্জা আছে বৈ কি। ওদের মতো না হলেও দেখে চট করে বিধবা বলে ধরবার উপায় নেই। মুখেও নেই বিষণ্ণতার হিমশীতল ছাপ।

শক্তিভূষণ কয়েক সেকেণ্ড প্রায় বজ্রাহতের মতোই তাকিয়ে রইলেন, তারপরই মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে যাবেন, আর সেই সময় একটা বেহায়া ছুঁড়ি কিনা রাস্তার ওপার থেকে চেঁচিয়ে উঠল, এই বউদি, বউদি, তোমার বাবা!···মেসোমশাই, মেসোমশাই! এদিকে তাকান।

বাবা অবশ্য শুনতে পেলেন না।

দ্রুত চলে এলেন।

কিন্তু তারাই বা ছাড়বে কেন ?

গাড়ি চড়ে আরো দ্রুত চলে এলো বাইশ নম্বর টিয়াবাগানের দরজায়।

শক্তিভূষণ এসে দাঁড়াতেই, মেয়েটা গাড়ি থেকে বলে উঠল, মেসোমশাই, আমরা ডাকলাম শুনতে পেলেন না ?

মেসোমশাই শান্ত পাথুরে গলায় বললেন, আমায় কেউ ডাকছে, বুঝতে পারি নি।

কত জোরে ডাকলাম !…বউদি এসেছে আমাদের সঙ্গে—

বউদি ! বউদি কে ?

আর একটা মেয়ে বলে উঠল, ওমা ! এই যে শোভা বউদি। আপনার মেয়ে ! আমাদের বুঝি চিনতে পারেন নি ?

শক্তিভূষণ গাড়ির মধ্যেটা একবার অবলোকন করলেন।

দেখতে পেলেন কাঠ হয়ে বসে আছে একজন, গাড়ির ওদিকের জানলার বাইরে চোখ ফেলে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু শাঁখের মতো ধবধবে ঘাড়ের একটু অংশ। আর তার উপর পড়ে থাকা হালকা নীল রঙা সিল্কের শাড়ির কোমল ভাঁজ।

এই কোমল দৃশ্যের উপর একটা পাথরের চাঁই পড়ল, ঠিকই বলেছ, বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম—থিয়েটারের শেষে অ্যাকট্রেসরা কেউ বেরিয়ে আসছেন।

সঙ্গের নির্বাক যুবকটির হাতেই ছিল—গাড়ির চালনচক্র। সে সেই মুহূর্তেই সেই চক্রে হাতের চাপ দিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ঘটনাটা ঘটে গেল বাড়ির বাইরেই, তবু ভিতরে এসে আছড়ে পড়তে দেরী হলো না। খবর বাতাসবাহিত হয়েও আসে। আর এ তো তিপু নামের ছেলেটা সেখানেই দাঁড়িয়েছিল।

শেফালী বসে পড়ে বলল, এই কথা বললে তুমি !

আমার যা মনে হয়েছিল তাই বলেছি।

যা মনে হয় তাই বলে ফেলতে হবে ? এ অপমানে যদি ওরা শোভাকে আর না পাঠায় ?

তা হলে তো শাপে বর। পাঠালে তো আবার ঢুকতে না পেয়ে ফেরত যেতে হতো।

কী ? কী বললে তুমি ? শোভা এলে তুমি তাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না ?

নীতিরীতিহীন বিধবা মেয়েকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

উঃ ! নিজের মেয়েকে এই কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করল না ?

লজ্জা পাবার হিসেব তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না।

শোভা পর্বের এইখানেই ইতি।

বাড়িতে আর কেউ শোভা নাম উচ্চারণ করে না। যে যা করে নিভৃতে।

এই যে তিপু, সেও তো মনে মনেই বলল, দেখেছিস তো দিদির দুর্দশা। মুখে নয়। অথচ ছ্যাখ, দাদা টাকা দিতে চায়, তাও নেবে না বাবা। মাকে পর্যন্ত এমন ইয়ে করে বলবে যে, মাও লজ্জায় নিতে পারবে না। মনে আছে সেবার বউদি মার কাছে বলেছিল, আমাদের ইস্কুল-কলেজের মাইনেগুলো অন্তত যদি দাদা দিতে পায়, বাবা শুনে কী বলেছিল মনে আছে?

মনে আবার থাকবে না কেন? সেই অবধি তো বউদি এ বাড়ি আসা ছেড়েছে। বলল কিনা, টিয়াবাগান বস্তিতে অনেক গরীব-গুরবো ছেলে আছে বউমা, ও টাকাটা বরং তাদের দিতে বোলো শান্তিকে। নাম হবে, পুণ্যি হবে। ভস্মে ঘী ঢেলে কী হবে?

বাবার মতো এমন কিম্ভুত লোক তুই আর কারুদের বাড়ি দেখেছিস মেজদি?

জানি না ভাই, কটা বাড়িই বা দেখেছি? এই বাইশ নম্বর টিয়াবাগান গোয়ালেই তো জীবনের তেইশটা বছর কেটে গেল। দম আটকে বসে আছে—

এই সময় আলোটা জ্বলে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই শেফালীর চাঁচাছোলা গলার ডাক শোনা গেল, বিভা,বিভা। গেলি কোথায়?

বিভা নীচু গলায় স্বগতোক্তি করল, যাবো আবার কোন্ চুলোয়! তারপর দ্রুত গলা তুলে বলল, যাই—যাচ্ছি!

আবার দ্রুত গলার স্বর নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তখনকার কথাটা যেন মাকে বলে ফেলিস নি তিপু।

মার সঙ্গে আমার ভারী গপ্‌পো। তবে ওই ছেলেটা তো একটা বাজে ছেলে।

বিভা জ্বলন্ত গলায় বলে উঠল, তা আমার ভাগ্যে আবার কোন্ রাজপুত্তুর জুটবে শুনি? আমি শুধু এ বাড়ি থেকে বেরুতে পারলেই বাঁচি। বাবা কি কোনো দিন দেবে বিয়ে? ভাববে মেয়ের বিয়ে বলে একটা কথা আছে?…পণ দেবেন না, আদর্শ নষ্ট হবে। দিদির মতন কি রূপ আছে আমার যে—

বিভা, পিঁড়িগুলো পাত এসে? রাত কম হয়েছে?

আঃ বাবা যাচ্ছি। এই তো আলো এলো—

চলে গেল বিভা।

তখন অন্ধকারে মেয়েকে কেমন এক রকম করে যেন চলে যেতে দেখে পর্যন্ত শেফালী চিন্তায় রয়েছে। কোথায় ছিল এতোক্ষণ? রান্নাঘরের পিছনের দাওয়াতে বা বসে

হয়েছিল কেন ? কখন থেকে ? মেয়ের যে আজকাল বেশ একটু উচক্কা ভাব হয়েছে তা ঠিকই অনুভব করছে শেফালী। মায়ের দৃষ্টি হচ্ছে ক্ষুরধার। ও দৃষ্টির কাছ থেকে আত্মগোপন করবার ক্ষমতা সন্তানের নেই। অন্তত তরুণী কুমারী মেয়ের তো নয়ই।

ভগবান জানেন, কোথাও কারো সঙ্গে ভাব ভালবাসা করে মরছে কিনা। রাস্তায় তো বেরোয়।

শোভার তো স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুকেও তো গেল সব। বাপের সেই অভিজ্ঞতাই বিভার কলেজে পড়ার পথ করে দিয়েছে। শক্তিভূষণের মতো প্রাচীনপন্থী লোকও বলেছিলেন, এক্ষুনি থেকে আবার বিভার বিয়ে বিয়ে করে রব তুলছো কেন ? শিক্ষা হয় নি ? থাক পড়ুক। বিয়েই যে হতে হবে, তার কী মানে ? অনেক মেয়েই আজকাল নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে।

শেফালী দেয়ালকে শুনিয়ে বলেছিল, ভূতের মুখে রাম নাম। মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তবে পাকেচক্রে পড়াটা চলছে। যদিও 'যথা বয়সে' নয়। কারণ স্কুলে ভর্তির সময়টাই যে যথা বয়েসটা পার হয়ে গিয়েছিল। শক্তিভূষণের খেয়াল হয় নি মেয়েদেরও স্কুলে ভর্তি করতে হয়, যখন খেয়াল হলো দু' তিনটে বছর নষ্ট হয়ে গেছে।

মেয়ে কলেজে পড়ছে, এটা শেফালীর আনন্দ।

আবার মেয়ে একা রাস্তায় বেরোবার সুযোগ পাচ্ছে, এটাও শেফালীর আতঙ্ক। আর কিছু নয়, ভয় শক্তিভূষণকে। ওই তো আগুন চাপা মানুষ। হঠাৎ যদি টের পেয়ে যান মেয়ে কোথাও ভাব ভালবাসা ঘটিয়ে বসেছে। তা হলে যে কী করতে পারেন, আর কী করতে পারেন না, জানা নেই শেফালীর।

তাই শেফালীর মেয়ের গতিবিধির উপর সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু ওদিকে যে আবার মেয়ের বাক্যাবলী আরো তীক্ষ্ণ। কিছু বলতে ভয় করে। মেয়ে তো নয়, যেন আগুনের খাপরা। বুঝলাম তোর ভেতরে অগ্নিজ্বালা—এই বয়েসে না পায় একটু ভালো খেতে না পায় ভালো পরতে না পায় আজকের পৃথিবীর কোনো পাওনা পেতে। আর মনের অগোচর চিন্তা নেই, 'যৌবন জ্বালা' বলেও তো একটা জিনিস আছে ? গায়ের জোরে উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না সেটাকে ? তাই আজকের ছেলেরা মানুষ না হয়ে বিয়ে করবো না বলে বয়েস পার করে চুলের গোড়ায় পাক ধরিয়ে আর মাথার মাঝখানে টাক ধরিয়ে আইবুড়ো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিকই। আর মেয়েরাও অবিরত লেখাপড়া করে শুকনো কাগজ তুলো হয়ে উঠেও আরো কিছু পড়ে ফেলার তাল করছে বটে, কিন্তু জ্ঞানতপস্বীর সৌম্য শান্ত মূর্তিতে ক'জন ?

মেজাজের পারা সর্বদাই তো সর্বোচ্চে চড়ে বসে আছে ওদের।

শেফালী বোকা হতে পারে, কিন্তু এসব সে বোঝে কই? তার বড়ছেলের মেজাজ তো এমন নয়। তার কারণ তার পিত্তি পড়ে যাবার অবস্থা ঘটবার আগেই পেটে ভাতজল পড়েছিল।

কিন্তু ছেলের বিয়েটা শক্তিভূষণ সাত তাড়াতাড়ি দিলেন যে? তা হলে বলতে হয়, শক্তিভূষণ দেন নি, দিয়েছিল শান্তিভূষণের ভাগ্য। অফিসের 'বস' তাঁর এক বন্ধু কন্যার জন্যে উঠে পড়ে লেগে শক্তিভূষণের ভাঙা উঠোনের মাটি নিয়েছিলেন এবং শেষ অবধি সফল হয়েছিলেন।

শক্তিভূষণের হাতে তখন যুক্তির অস্ত্রটা দুর্বল।

ছেলের এখনো বিয়ের বয়েস হয় নি?

ছাব্বিশ বছর বয়সটাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না।

ছেলের উপার্জন যথোপযুক্ত নয়?

তার ব্যবস্থা তো তিনিই করে দিচ্ছেন। 'বস' যখন।

শ্বশুরের সাহায্যে পদস্থ হওয়াটা পুরুষের পক্ষে অ-পদস্থ হওয়ারই প্রমাণ?

কা আশ্চর্য! শ্বশুর কোথায়? এখনো তো হিতৈষী বস! তা ছাড়া শ্বশুরের বন্ধুকেও যদি 'শ্বশুর' বলতে হয়, তা হলে তো অবস্থা অচল।

শেষের কথাটা স্বয়ং শান্তিভূষণের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল। অথচ একে ঠিক অবিনয়ও বলা যায় না, বিয়ে পাগলামিও নয়। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি কে না চায়? শক্তিভূষণ যদি উন্নতিকে 'অবনতি' বলতে চান, সেটা তাঁরই মনের দোষ। অথবা সূক্ষ্ম ঈর্ষা। যেটা কৃতী ছেলের প্রতি অকৃতি বাপের অবচেতনের খেলা।

শেফালীর প্রকাশভঙ্গীতে কোনো সূক্ষ্মতা নেই, তাই শেফালী অনায়াসেই বলে বসে, আমি সব বুঝি। ছেলের বাড়বাড়ন্ত দেখে হিংসেয় কুরে খায় তোমায়। তাই এই সব লম্বা লম্বা আদর্শের বুলি আর ছেলেকে 'ঘুষখোর ঘুষখোর' বলে গায়ের ঝাল মেটানো।

এসব কথার অবশ্য উত্তর দেন না শক্তিভূষণ, অবজ্ঞায় ঘৃণার হাসি হেসে সরে যান।

এতোবার ডাকতে হয় কেন? অ্যাঁ? সেই থেকে ডেকে মরছি।

মায়ের অনুযোগে বিভা অবহেলায় বলে, দেরী আবার কী? পাখি হয়ে উড়ে আসবো না কি? তোমার দাদাশ্বশুরের ওই দালানখানি পার হয়ে আসতে সময় কম লাগে?

দেয়ালে ঠেসানো ভারী ভারী কাঁঠাল কাঠের পীঁড়ি ক'খানা দুম দুম করে মাটিতে পেতে ফেলে বিভা।

শেফালী জামবাটিতে রাখা রুটির গোছা থেকে গুণে গুণে বড় বড় থালায় সাজাতে

সাজাতে বলে, আমারই দাদা শ্বশুর ? তোদের কেউ নয় ?

আমাদের আবার কে ? কেউ না ! আমরা তো আগাছা পরগাছা।

তা ভালো ! পর গোত্তর হবার আগেই নিজেকে পর ভাবতে শিখেছিস।

যা সত্যি। তাই ভাবতে হয়। মেয়ে যে কী দিদিই তার সাক্ষী !

দিদির নাম মায়ের সামনে বড় একটা করে না কেউ, আজ করে ফেলল বিভা।

শেফালী নিঃশ্বাস ফেলে বলে, একের পাপে আরের দণ্ড ! তোদের নির্মায়িক বাপ নিজের চালে চলবে, যা খুশী করবে, তার দায়িক হই আমি।

তোমায় কেউ দায়িক করে নি বাবা, দোহাই তোমার কেঁদো না।

গলা তোলে বিভা, তিপু, খেতে দেওয়া হয়েছে। তারপর রান্নাঘরের একধারে রক্ষিত একটা ইঁট ঠেসানো তেপেয়ে সরু চৌকীর উপর ঘুমিয়ে থাকা ইভাকে ঠেলা দিয়ে ডাক দেয়, খুকু এই খুকু, ওঠ। খাবি না ?

এটা বিভার নিত্য কর্ম।

মা যতক্ষণ রাঁধবে ইভা মায়ের কাছ থেকে নড়বে না, মা যত আনাগোনা করবে, ইভা ততক্ষণ তার পায়ে পায়ে ঘুরবে আর সন্ধ্যে পার হয়ে গেলেই ওই তেলচিটে চৌকীটায় শুধু কাঠের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

ঠাণ্ডা কাল হলে শেফালী হয়তো তার নিজের একটা ময়লা শাড়ি পাট করে চাপা দিয়ে দেয়, বেশী ঠাণ্ডায় হয়তো একটা ছেঁড়া পুরনো র‍্যাপার।

'ঘরে গিয়ে শো', বললে সহজে যেতে চায় না।

দীপু সাধারণত রাত করে ফেরে, বাপের সঙ্গে একসঙ্গে খায় না, পরে খায়। তবে দৈবাৎ কোনোদিন সকাল সকাল ফিরলে, মায়ের কাছে এসে তাড়া দেয়, আমায় আগে চটপট দিয়ে দাও দিকি। মালিকের আগে খেয়ে নিয়ে কেটে পড়ি।

তখন খেতে খেতে চারিদিক তাকিয়ে বলে, তোমার এই রান্নাঘরের দৃশটি মাদার যে কোনো সিনেমা ডিরেকটরের কাছে লোভনীয়। একশো বছর আগের একটি গ্রামীণ রান্নাঘরের ছবি তুলতে চাইলে, গ্রামে গিয়ে ঘুরে মরতে হবে না। অবশ্য গ্রামেট্রামেও এখন আর সহজে এমন প্রাচীন দৃশ্য মেলে কিনা সন্দেহ।

হয়তো কথাটা আতিশয্য নয়। আলকাৎরা মাখানো ভারী ভারী কাঠের কড়ি বরগায় লাগানো লোহার আংটা থেকে দড়ির শিকে ঝুলছে, এমন দৃশ্য এ যুগে বিরল। কিন্তু নতুনত্ব আনবার উপায় বা কোথায় শেফালীর ? যা আছে তাই নিয়েই তো চালিয়ে চলেছে। চিরকাল। রান্নাঘরে যেমন গোটা পাঁচ ছয় ওরকম আংটা আছে, তেমনি রান্নাঘরের ধারে কাছে গোটা আট দশ মেঠো ইঁদুরের আনাগোনাও তো আছে। আত্মরক্ষার ওইটাই সহজ উপায়।

কত কত দিন কি ভাবে না শেফালী একদিন ওই একটা আংটায় দড়ি বেঁধে নিজেই ঝুলে থাকবে। হ্যাঁ, অনেক অনেক দিন ভেবেছে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি।…ঠিকমতো দড়ি জোগাড় করা যায় না, দড়ি বাঁধতে অত উঁচু টুলই বা কই বাড়িতে? তা ছাড়া রান্নাঘরের তিন তিনটে দরজার একটারও তো হুড়কো নেই, ইঁট ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়। খিল ছিটকিনি খোলা দরজা দরজা ঘরে ওই সব করতে এসে যদি ধরা পড়ে যেতে হয়? …ছ' ছটা ছেলে মেয়ে, ছোট থেকেছে তো কিছুদিন করে হঠাৎ ঠিক সেই সময় মাকে বিছানায় না দেখে যদি ডেকে ওঠে।

আর শক্তিভূষণের তো চিরকাল ঝিঁঝির পাখার মতো পাতলা ঘুম।…তা হলে কী কী হতে পারে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা মনে করেই শেফালীর সকল জ্বালা জুড়িয়ে ফেলবার বাসনাটা আর মেটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সকালে উঠে লক্ষ কাজের নাগপাশে বাঁধা মনটায় রাত্রের কল্পনাটা অবাস্তব লাগে। …আবার আস্তে আস্তে আশার ছলনা মোহময় রঙিন ছবি খুলে ধরে।

যদি শক্তিভূষণের সুমতি হয়, যদি শক্তিভূষণ তাঁর অপরাপর জ্ঞাতিদের মত—পিতৃপুরুষের ফেলে রেখে যাওয়া মাটির বিনিময়ে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে ফেলেন, তা হলে তো আর শেফালীর এতো জ্বালা থাকে না। 'দারিদ্র্যের তুল্য জ্বালা নেই।' শেফালীর অন্তত এই ধারণা।

ওই জ্বালাটার পিছন পিছনই তো লাইন দিয়ে এসে দাঁড়ায় আরো বহুবিধ জ্বালা। ছেলেমেয়েদের সদা সর্বদা অসন্তোষ আর অভিযোগের জ্বালা, আত্মীয়জনের কাছে ছোট হয়ে থাকার জ্বালা, সামাজিক জীবনে প্রতি পদে খুঁড়িয়ে চলার জ্বালা, আর সেই খুঁড়িয়ে চলার পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়ার জন্য সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জ্বালা।

বিচ্ছিন্ন তো বটেই।…শক্তিভূষণের নীতি—দামী দামী উপহার হাতে নিয়ে না যেতে পারলে বড়লোক জ্ঞাতি কুটুমের বাড়ি যাওয়া চলবে না? তা হলে সেই চলাটাই বাদ দাও।

সবাই তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে-সাদী ভাত-পৈতেয় তোমায় নেমন্তন্ন করে, তোমারও একবার আধবার না করলে মুখ থাকে না? তা হলে এর পর থেকে যারা নেমন্তন্ন করতে আসবে, তাদের জানিয়ে দেবে তোমার নেমন্তন্ন নেওয়ার অক্ষমতার কথা। …সম্পর্কটা যখন লেনদেনেই দাঁড়াচ্ছে, তখন সম্পর্কের বন্ধনটাই শিথিল করে ফেলা ভাল।

বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে, তাকে সিঙ্গাড়া রসগোল্লা খাওয়াতেই হবে এমন কী কথা? লোকে বেড়াতে আসে গল্প করবার জন্যে, দেখা করবার জন্যে, চা সিঙ্গাড়া

খাবার জন্যে নয়।

পুজো? ব্রত নিয়ম, মানসিক?

সেটা তো হৃদয়ের ভক্তির ব্যাপার, তার জন্যে এতো উপচার আড়ম্বরের কী দরকার? পাঁচশো টাকার পুজো হলেই ঠাকুর নেবেন, পাঁচ পয়সারটা নেবেন না? তা হলে তেমন ঠাকুর পুজো করায় পুণ্যি নেই, বরং পাপ আছে।

অসুখ বিসুখে?

বড় ডাক্তার না আনতে পারলে বড় অসুখ সারবে না? এতো আহাম্মুকের ধারণা। সারবার হলে তুলসীপাতার রসে সারে, না সারবার হলে ধন্বন্তরির বাবাকে ডেকে নিয়ে এলেও সারে না।

সারা জীবন ধরে শেফালী শুধু এই রকম সব মহৎ মহৎ বাণী শুনে এলো। …শক্তিভূষণের একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে, আর একটা সরল গৃহচিকিৎসার বই। আগে আগে ওই চিকিৎসাই সার ছিল, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে পর্যন্ত আর বাবার ওষুধ খেতে চায় না। শেফালী তো কোনো কালেই না।

কিন্তু কবেই বা চিকিৎসার দরকার পড়েছে শেফালীর? ভগবানও তার প্রতিপক্ষ বৈ কি। না হলে জীবনে একটা শক্ত অসুখ হয় না একটা মানুষের? খেটে খেটে যে মানুষটা হাড়সার।

ভারী দুঃখ হয় শেফালীর।

আত্মহত্যাটা যখন করে উঠতে পারে না, তখন কতদিন ভাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হার্টফেল করার কত কাহিনীই তো শুনেছি, আমার ভাগ্যে তেমন হয় না? সকালে উঠে সবাই দেখল শেফালী—

তেমন দুঃখের কথা ভেবে ভেবে শেফালী কতদিন নিজের শোকে নিজে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। কিন্তু তেমন ঘটনার নায়িকা হওয়া তার ভাগ্যে হয়নি।

চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মতই সকালবেলা সবাই উঠে দেখে চলেছে শেফালী উনুনে আগুন দিচ্ছে, বালতি নিয়ে জল ভরছে, চাল ধুচ্ছে, উনুন ধরলে চায়ের কেটলী চাপাচ্ছে।

শক্তিভূষণও অবশ্য নিয়মের চাকায় বাঁধা। যখন অফিস যেতেন, তখন একটা নিয়ম ছিল, এখন অন্য। সে নিয়মের প্রথম কাজ 'বাগানের' তদারকী করা। মাটি খুঁড়ছেন, চারা পুঁতছেন, মাচা বেঁধে লতানো গাছকে তার উপর তুলছেন। এ সময় ছেলেমেয়ে ওঠে না, শেফালীই নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখে।

আর সকালের এই নমনীয় আলোয় এক এক দিন শেফালীর মনটা একটু নমনীয়

হয়ে পড়ে। কাছে এসে দাঁড়ায়, বিগলিত বিগলিত গলায় বলে—চিরটা কাল তো আপিসের চাকরি করলে। এ সব শিখলে কবে বলো তো?

শক্তিভূষণ অবশ্য এসব কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, আপন কাজ করে যান।

শেফালীও কথার প্রত্যাশা করে না।

হয়তো আর একটু তাকিয়ে দেখে বলে ওঠে, ওমা, সীম গাছটায় যে অনেক সীম ধরেছে।

কৃপা হলে শক্তিভূষণ হয়তো একটু হাসেন, বলেন, আশ্চর্য তো। সীম গাছে সীম ফলেছে!

শেফালী কৃতার্থমন্য মুখে গলা নামিয়ে বলে, আহা! তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!

কোনো কিছুতেই ঠাট্টা নেই শক্তিভূষণের, যা আছে তিক্ত ব্যঙ্গ, এবং তার হুলের জ্বালা শেফালীর হাড়ে হাড়ে জানা। তবু এ রকম এক একটা মহামুহূর্তে এ ধরনের একটু কথা বলে সুখ পায় শেফালী।

কিন্তু এমন মহামুহূর্ত ক'দিনই বা আসে? পর দিন সকালেই হয়তো ঘুমন্ত ছেলে মেয়েদের কানে আছড়ে আছড়ে এসে পড়ে মায়ের তীব্র তীক্ষ্ণ আক্ষেপ।

হিসেবের দু' দিন আগেই কয়লা ফুরলো কেন তার কৈফিয়ত দিতে হবে? কয়লা আমি খেয়েছি। সকলের থেকে পেটের জ্বালা বেশী তো! তাই মুঠো মুঠো পার করে অসময়ে ফুরিয়েছি! হল? হিসেব পেলে তো?

এই হচ্ছে বাইশ নম্বর টিয়াবাগানের বাসিন্দাদের দিনের বাণী।

অথচ এখুনি এই সমস্ত কটুতা, তিক্ততা নীচতা আর কুশ্রীতার অবসান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যার হাতে সেই অবসানের ভার, সেই দারিদ্র্যের অহঙ্কারে মদমত্ত আত্মপ্রেমী লোকটার কি সত্যিই হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই?

কে জানে আছে কি না। সে তো তার 'দিনের বাণী' কাউকে দেখতে দেয় না।... হ্যাঁ, তার একটা খাতা আছে। সেই খাতার সাক্ষী তার ভাঙা নড়বড়ে টেবিলটার উপর রাখা লম্বা গলা চিমনি বসানো কেরোসিন ল্যাম্পটা।...এই টেবিলটায় নাকি শক্তিভূষণের বাবা সত্যভূষণ লেখাপড়া করেছেন। পরে শক্তিভূষণও করেছেন। বাবাকে খুব বেশী মনে পড়ে না শক্তিভূষণের, শুধু ওই দৃশ্যটাই মনে পড়ে। টেবিলের ধারে মাথা নীচু করে ঝুঁকে বসে বাবা কী লিখছেন। বাবার মুখের রেখায় রেখায় টেবিল ল্যাম্পের আলোর আভাস।

সেটা কিন্তু এ আলো নয়, বিদ্যুতের আলো।

বাবাই না কি এই ভটচাযি্য বাড়িতে প্রথম বিদ্যুতের আলো আনিয়েছিলেন রাস্তা থেকে লাইন টেনে। সেটা শক্তিভূষণের দেখা নয়, মায়ের মুখে শোনা। জ্ঞাতিরা না কি এই আলো আনাটাকে 'ফ্যাসান' বলে অভিহিত করেছিলো, বলেছিলো 'বিলাসিতা বাবুয়ানা', তারপর আবার না কি নিজেরাও ঝপাঝপ সেই ফ্যাসানে গা ঢেলেছিল।

তা এই ধরনের পরিবেশে এই রকমই তো হয়ে থাকে।

সত্যভূষণের আগের জেনারেশনে যখন রেড়ির তেলের প্রদীপের জায়গায় কেরোসিন এসে ঢুকেছিলো, তখনও ওই ফ্যাসানের কথা উঠেছিলো বৈ কি। তার সঙ্গে একথাও উঠেছিলো, ওই কেরোসিন কোনদিন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সব ধ্বংস করবে। অতঃপর আবার একে একে সবাই—

সত্যভূষণের বিজলী আলোর প্রবর্তনের প্রধান কারণ জ্যোতিষ চর্চা করতেন তিনি, এবং সন্ধ্যার পরই তাঁর কাছে খদ্দের সমাগম হতো। তিনিও তো জাহাজ ঘাটায় না কোথায় চাকরি করতেন। সন্ধ্যাটাই তাঁর শৌখিন জ্যোতিষ চর্চার অবসর। লোকের করকোষ্ঠি বিচার করতে জোর আলোর দরকার। বাবা জ্যোতিষ চর্চা করতেন, তার জন্য মায়ের মুখে আক্ষেপও শুনেছেন বৈ কি বালক শক্তিভূষণ, 'ওই জ্যোতিষ জ্যোতিষ' করে মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছল শেষ অবদি। ওই ধ্যান-জ্ঞান! আপিসেও না কি লোকের হাত দেকে দেকে সব বলে দিতেন।...লোকেদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে কুষ্ঠি মিলিয়ে দিতেন।...তা এমনি মানুষ, কখনো কারুর কাচ থেকে একটা আদলা নিতেন না।...লোকে সেদে দিতে এলেও না। বলতেন এ হলো স্বর্গীয় বিদ্যে, এ বেচে পয়সা নেবো? তা ছাড়া জানিই বা কতটুকু? বুঝিই বা কী? এই রেস্তো নিয়ে ব্যবসা ধরবো? ছিঃ।

বাবার গল্পই ছিল শিশু শক্তিভূষণের কাছে সব থেকে প্রিয় গল্প। সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম সেরে মা যখন ছেলেকে কাছে ডেকে বলতো, আয় খোকা গপ্‌পো বলি—কিসের গপ্‌পো শুনবি? রাজা রাণীর? বাঘের? ভূতের?

তখন খোকা বলে উঠতো, বাবার গপ্‌পো মা, বাবার গপ্‌পো।

মার কণ্ঠে বিষাদের সুর বাজতো, তাঁর গপ্‌পো আর রোজ রোজ কী শুনবি বাবা? রাজা রাজড়া তো ছিলেন না বীরটীরও ছিলেন না, গেরস্ত মানুষ! কতোই বা গপ্‌পো!

তা হোক! 'মানুষটার' গল্পই শুনতে চায় একটা আকুল শিশুমন যার অনুভূতির জগতে রেখায় রেখায় আলোর বর্ডারটানা একখানা মুখ স্থির হয়ে আছে।

বাবা আপিস যাবার সময় কোট পরতো মা?

ছি বাবা! 'পরতো' বলতে নেই, বলতে হয় পরতেন। হ্যাঁ, কোট পরতেন বৈ কি। ফর্সা কাপড়, ফর্সা কামিজ, আর কালো কোট। খুব মানাতো, খুবই সোন্দর মানুষ ছিলেন তো। তোকে সবাই ফর্সা ছেলে বলে, তুই তাঁর কাছে দাঁড়ালে কালো।

বাবার কেন ফটোগ্রাপ নেই মা? বোকনদার বাবার তো ফটোগ্রাপ আছে।

বোকনদার বাবা বলচো কেন খোকা? জ্যাটামশাই বলবে তো? তা তিনি বাইরে বাইরে কাজ করতেন, কত সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ ছিল, তারাই কেউ একটা ফটক তুলে দেচেন। ইনি তো আলা ভোলা মানুষ ছিলেন! ও সবে মন ছেল না। একন ভাবি। থাকলে একখান ঠাকুর ঘরে রেকে দিতুম।

নাঃ ঠাকুর ঘরে রাখবার মত কোনো ছবি ছিল না সত্যভূষণের। শক্তিভূষণের মা তাই এতোটুকু একটি মন্দির বানিয়ে, এতোটুকু একখানি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, নিত্য পূজা করতেন সেটি।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা।

যেমন ক্ষমতা, তেমন মন্দির।

তুলসী মঞ্চেরই সমগোত্র। চূড়োর ত্রিশূল-ফিশুল নিয়ে বড়জোর হাত তিনেক উঁচু। তার মধ্যেই এতোটুকু দরজা দেওয়া একটু ঘর।

ভাসুরের সঙ্গে তো কথা চলে না, সব থেকে বড়জা যিনি তখনো বাড়ির গিন্নী তাঁর কাছেই ইচ্ছা জ্ঞাপন।...তা অল্প বয়েসে বিধবা হয়ে যাওয়া ভাদ্রবধূর এই করুণ ইচ্ছাটির মর্যাদা রেখেছিলেন ভাসুর। সদর দরজার ডান দিকে স্থাপিত চির-কালের তুলসী মঞ্চেরই গড়নের আর কাছাকাছি মাপের ওই মন্দিরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন দরজার বাঁ দিকে।

এটা শক্তিভূষণের স্পষ্ট মনে আছে।

মন্দির বানাতে না কি হিঁদু মিস্তিরি আনতে হয়, আর ঠাকুর পিতিষ্ঠে করতে পুরুত মশাই। বার উঠোনের ওইখানে অনেকটা জায়গা গোবর মাটি লেপা হয়েছিল, আর সেখানেই পুজোর আয়োজন সাজানো হয়েছিল। পুরুত মশাইয়ের জন্যে আসনও পাতা হয়েছিল সেখানে।...ঘণ্টা কাঁসরও বেজেছিল। শক্তিভূষণের খুব ইচ্ছে হয়েছিল সে কাঁসরটা বাজায়, কিন্তু বড়জ্যাঠার ছেলে ভাঁটুদা, কিছুতেই সেই অধিকারটা ছাড়েনি। বলেছিল, তুই ছেলেমানুষ হাতে লাগিয়ে ফেলবি।

শক্তিভূষণ অতএব ঘোমটা দিয়ে করজোড়ে বসে থাকা মায়ের দিকেই তাকিয়ে বসেছিল।...এক আধবার ঘোমটা একটু সরে যেতে অবাক হয়ে দেখেছিল শক্তি, মায়ের ওই পাশফেরা মুখটায় রেখায় রেখায় বাবার মুখের মতই আলো। অথচ ওখানে কোনো টেবিল ল্যাম্প ট্যাম্প ছিল না। শক্তি চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল

আলোটা কোথা থেকে আসছে।

দরজার ধারের ওই মন্দিরটা মায়ের সেই একান্ত প্রার্থনার বস্তু। তিপুরা যাকে ঠাট্টা করে বলে, বাবার সাধের মন্দির। আর ইচ্ছে করে আকাচা জামা প্যান্ট পরে একটু ছুঁয়ে দেয়।

বাবার সেই ইলেকট্রিক আলোর বাল্ব বসানো টেবল ল্যাম্পটা একবার বড়জ্যাঠামশাই কী কাজে যেন নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আর সেটা দেখতে পায়নি শক্তিভূষণ নামের সেই ছেলেটা। ছেলেটা একটু রগচটা ছিল, অনেকবার বলেছিল মাকে, যাচ্ছি আমি বড়জ্যাটার কাছে। জিগ্যেস করি, বাবার আলোটা কোথায় গেল?

মা 'চুপ চুপ' করে থামিয়েছে।

আমার বাবার জিনিস না!

তা হোক, ওঁরও তো ভাইয়ের জিনিস, খবরদার যেন কোনোদিন বলে ফেলো না।

এখনো কদাচ কদাচ তিপুকে জিগ্যেস করে উঠতে ইচ্ছে করে শক্তিভূষণের, হ্যাঁরে তনাদের বাড়িতে এরকম কোন টেবলল্যাম্প দেখেছিস কখনো, যেটা দেখতে একটা হাত উঁচু করা মানুষের মতো, সেই উঁচু করা হাতটায় আলোর বালব।

ইচ্ছে করে বলেন না।

কে জানে, কী উত্তর দিয়ে বসবে তিপু। হয়তো বলে উঠবে আমি বুঝি ওদের বাড়ির সব জিনিস দেখে বেড়াই?

নয়তো বলে বসবে, নিজে গিয়ে একবার দেখলেই পারো। নিজের লোক, পাশের বাড়ি। গেলে কী হয়? কতবার তো নেমন্তন্নও করেন পুষ্পকাকা।

তা করেন বটে!

শক্তিভূষণের ওই জ্ঞাতিভাই পুষ্পভূষণ মাঝে মাঝেই নেমন্তন্ন করে। ছেলের পৈতেয় করেছে, বড়মেয়ের বিয়েয় করেছে, ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে করে। যা করে তাতেই ঘটা! ওর ওই চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির যত ভাড়াটে সবাই এসে জোটে পুষ্পভূষণের দোতলার হলএ। বাঙালী অবাঙালীতে গিস গিস করে সিঁড়ি। শক্তিভূষণের পোষায় না।

পুষ্পর মেয়ের বিয়েতে একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, তা সে শুধু দাঁড়ানোই। আর যান না, নিমন্ত্রণ রক্ষার দায় ছেলে-মেয়েদের আর শেফালীর ; তাওতো হুকুম আছে সাজসজ্জার অভাব অথবা—উপহার দ্রব্যের ঘাটতিতে যদি নিজেকে নীচু মনে হয়, যাবার দরকার নেই। শেষ অবধি তিপু আর বিভাই রেখেছে সম্পর্কটা।

অতএব শক্তিভূষণের কোনোদিন আর দেখা হয়নি, সেই হাত উঁচু করা মানুষের

চেহারা দেওয়া টেবললাম্পের স্ট্যাণ্ডটা ওদের বাড়ি আছে কিনা।

শক্তিভূষণ যে টেবল ল্যাম্পটা জ্বালেন, সেটা কেরোসিনের, নিজের কেনা। কেরোসিন-টাকে উনি বলেন স্বাধীন আলো। বিদ্যুতের খেয়ালে চলে না। নিজের হাতে তার চিমনি মোছেন, নিজের হাতে তেল ভরে রাখেন। আর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, বাড়ির সব আলো নিভে যায়, তখনই ওই ভাঙাচোরা চারচৌকো তিনপুরুষের টেবিলটায় সেই আলো বসিয়ে তাঁর দিনের প্রার্থনার খাতাখানা খুলে বসেন।

আজও বসলেন।

লিখলেন, মা, তুমি ছিলে সহায়-সম্বলহীন ছোট্ট একটা মেয়ে, ('ছোট্ট' ছাড়া কী, বাবা যখন মারা গেছেন, তখন তো তুমি বিভার থেকেও অনেক ছোট।) সেই যুগের বিধবা মেয়ে। তোমার কী ছিল বল ? না টাকা পয়সা, না অধিকার না সাহস।... শ্বশুরের ভিটের এই মাটির একটু ভাগের আশ্বাস ছাড়া আর কিছু না।...তবু সেই তুমি তোমার ছেলেটাকে একটা উচ্চ আদর্শের শিক্ষা দিতে পেরেছিলে। শিক্ষা দিয়েছিলে লোভের কাছে পরাস্ত না হবার, গুরুজনকে মান্য করবার, গুরুজন অন্যায় বললেও নীরবে মেনে নেবার।

আমি যখন বলতাম, জ্যেঠিমা তোমায় এতো খাটায় কেন ? তোমায় এতো বকে কেন ? তোমায় কিছু দেয় না কেন ?

মা, তুমি তখন শিউরে উঠে বলতে, ছি ছি খোকা। এই বুদ্ধি হচ্ছে তোর? আর কক্ষনো বলবি না এসব কথা।

মা, তুমি একটা ছোট্ট মেয়ে হয়েও তোমার ছেলেকে তোমার ইচ্ছেয় চালিত করতে পারতে। কিন্তু আমি ? আস্ত শক্তপোক্ত একটা পুরুষ। আমি ফেলিওর। আমি আমার সন্তানদের মধ্যে আমার ইচ্ছের চারা, আমার আদর্শের বীজ বপন করতে পারি নি।...আমার বড়ছেলে ঘুষখোর, আমার মেজোছেলে উদ্ধত অবিনয়ী বিলাসী। ভগবান জানেন কোথায় কীভাবে নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে সে তার বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ করে। আর আমার ছোটছেলে ? মেরুদণ্ডহীন লোভী। একটু ভাল মন্দ খেতে পাওয়ার লোভে সে তার বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে ধর্না দেয়।...আমার বড়মেয়ে ? বৈধব্যের পবিত্রতার ধার ধারে না সে। অথচ ওর থেকেও কম বয়েসে তুমি—হ্যাঁ আমার জ্ঞানাবধি তোমায় আমি বৈধব্যের শান্ত সুন্দর শুভ্র পবিত্রতার মূর্তিতে দেখে এসেছি।...আমি কোনোদিন তোমায় চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনি নি, জোরে হেসে উঠতে শুনি নি। তোমায় কোনো উৎসব আনন্দের মধ্যে দাঁড়াতে দেখি নি।...এই ভট্টাচার্য গোষ্টিতে এ বাড়ি ও বাড়ি বিয়ে-টিয়ে তো লেগেই

থাকতো, তুমি থাকতে ভাঁড়ার ঘরে রান্নাঘরে পুজোর ঘরে।...আর তোমার পৌত্রী ?...থাক তার কথা। আমার মেজ মেয়েও তো কুমারীর শালীনতায় বিশ্বাসী নয়। পরপুরুষকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ির মধ্যে ডেকে এনে লুকিয়ে অন্ধকারে প্রেমালাপ করতে বাধে না তার।

মা, একদিন হাতে-নাতে ধরতে পারলে আমি ওই মেয়েকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবো তা তোমায় জানিয়ে রাখছি।...জানি না আমার ছোটো মেয়েখানি পরে কী হবে!...শিক্ষার মূল বনেদ যেখান থেকে গড়ে ওঠার কথা, সেখানে ওদের শূন্যের অঙ্ক।

মা! ওরা ওদের মায়ের কাছ থেকে কী পেয়েছে? কোনো সদ্‌গুণ না। পেয়েছে শুধু অসন্তোষের শিক্ষা, অভিযোগের শিক্ষা, অসহিষ্ণুতার শিক্ষা।

কিন্তু আমি কি এ লড়াইয়ে হেরে যাব? তোমার আদর্শের শক্তি ব্যর্থ হবে? নাঃ। কিছুতেই না। আমি লড়ে যাব।

লিখলেন, তারিখ লিখলেন, তারপর লেখা পাতাগুলোকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে মুড়ে পাকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। ওই বাইরেটা অবশ্য বাড়িই মধ্যে। ওখানে একটা মস্ত গর্ত কাটা আছে, যেটা ডাস্টবিনের অনুকল্প। আসলে গুল দেবার জন্যে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ওখানটায় গর্ত করে তোলা হয়েছে।...কাঠের গরাদে দেওয়া ছোট্ট খুপরি জানলা, কষ্টে হাত গলানো যায়। তবু এটাই পদ্ধতি শক্তি-ভূষণের। বেশী রাত্রে কেরোসিন জেলে পাতা পাতা লিখে, সেটা ছিঁড়ে কুচিয়ে ফেলে দেন। হয়তো বা দেশলাই কাঠি জেলে পুড়িয়েও।

তবু লেখা চাই।

কোনো কোনো দিন কোলের মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শেফালী একটু প্রত্যাশা প্রত্যাশা মুখ নিয়ে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে আস্তে ঘরে ঢুকে বলে, এত রাত অবধি জেগে কী এতো লিখছ?

শক্তিভূষণ লেখায় বই চাপা দিয়ে বলেন, জেনে তোমার কোনো কাজ হবে না।

তা জানি। তোমার মনের কোন্ কথাটাই বা আমায় জানতে দাও। আমি তো তোমার সংসারের রান্না করার দাসীবাঁদি—

রাগ করে বেরিয়ে যায় দরজাটা টেনে না দিয়েই।...এই ঘরটা ভেতর বাড়ি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, সাবেককালে একে বলা হতো বৈঠকখানা।...খানিকটা উঠোন পার হয়ে দু'তিনটে সিঁড়ি উঠে দাওয়ার ওপর এই ঘর।

আগে ভিতর বাড়িতেই অবস্থান ছিল শক্তিভূষণের, ইভার জন্মের পর থেকে এই বৈঠকখানা ঘরে আস্তানা গেড়েছেন। শেফালী অবশ্য এতে খুবই মনঃক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ,

আহতও।...ছেলেমেয়েদের সামনে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, একটেরে একখানা ঘরে একা পড়ে থাকার যে কী মানে বুঝি না।...রাতবিরেতে কোনদিন শরীরটা যদি একটু খারাপই হয়, পচা পুরনো বাড়ি, কত রকম পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ, কামড়ে দিতেও পারে। চেঁচিয়ে ডাকলেও তো শোনা যাবে না। এদিকে কি ঘরের অভাব?

এমনিতে এসব কথার উত্তর দেন না শক্তিভূষণ। দৈবাৎ মেজাজ হালকা থাকলে একটু হেসে বলেন কীট-পতঙ্গ বলে আর মায়া বিস্তার কেন, বল না—সাপখোপ। তা জানো তো শাস্ত্রে আছে সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। বাঘের সঙ্গে দেখা হলেই বিপদ। কিন্তু সাপে কাটা জন্মকালেই কপালে লেখা থাকে।...আর লেখা থাকলে লোহার বাসরেও—তক্ষক হয়ে দংশায়। নচেৎ সাপের গর্তয় হাত ঢোকালেও নয়।

শেফালী খুব রেগে যায়।

বলে, তোমার সঙ্গে যে কথায় পারবে সে এখনো তার মাতৃগর্ভে আছে।...আর ছেলেদের আড়ালে চাপাগলায় বলে, ভয় নেই কোর্টে পেয়ে কেউ তোমার ধর্ম নষ্ট করতে যাবে না। যা হয়ে গেছে গেছে। ওই ভয়ে বাইরের ঘরে পড়ে থাকতে হবে না।

তবু আবার এক একদিন প্রত্যাশা প্রত্যাশা মুখ নিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে আস্তে ঘরে ঢুকে এসে বলে, রাতদুপুর অবধি কী এতো লেখো? লেখা তো কেউ চক্ষে দেখতে পায় না।...

তারপর রাগ করে চলে আসে দরজাটা খোলা রেখেই।

আর শক্তিভূষণ (কে জানে নিশ্চিন্ত নিদ্রার শেষে কিনা) ভোরবেলায় উঠে পড়ে মাটি খুঁড়তে লাগেন, গাছে জল ঢালেন গোড়ায় গোড়ায় গোবর সার দেন।... আর তখন হয়তো শেফালী বিগলিত বিগলিত মুখে বলে, এতোও পারো বটে! শিখলে কখন? চিরটাকাল তো আপিসে চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করেই কাটিয়ে এলে।...

হয়তো এইভাবেই বাকিটা কাল কেটে যেতো শেফালীর। অথবা শক্তিভূষণের। কিন্তু বাইরের পৃথিবী যে আঘাত হেনেই চলেছে। কেউ নিজের মতো করে থাকতে চাইলেই কি থাকতে দেয় পৃথিবী?

সমীরের দোকানটা এমন জিনিসের যে যখন তখন ঢুকে পড়ার কোনো যুক্তি নেই। তবু ছুতো সৃষ্টি করে ঢুকে পড়ে বিভা। আজ বলে, তোমার এই দোকান কিছু কিছু

স্টেশনারি জিনিস রাখো দিকি তাহলে এসে ঢোকবার একটা মানে দেখানো যায়। এখন দোকানে কেউ নেই।

সমীর কাউন্টারের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে বিভার গোলগাল গালে একটা ছোট্ট টোকা মেরে গলা নামিয়ে বলে, চিরকাল শুধু দোকানেই আসবে? ঘরে যাবে না?

যাওয়ানোর গরজ কোথায় তোমার?

আমি একটা দীনহীন তুচ্ছ দোকানী, আমার গরজ দেখাতে যাবার মুখ কোথায়? আমি কী এমন রাজকন্যে?

ওরে বাবা! রাজকন্যে কি, সম্রাটকন্যে! আমি তো রাস্তায় ওনাকে দেখতে পেলে শত হস্ত দূরে পালাই। যা চাউনি। মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন, নাকি নরকের ক্রিমি কীটের দিকে তাকাচ্ছেন···বোঝা যায় না।

বিভা অভিমান অভিমান গলায় বলে, তাহলেই বোঝো কত সুখে আছি আমরা। তা যেভাবেই হোক, তুমি একবার গিয়ে না বললে?

ওরে বাবা! আমায় ফাঁসি দিলেও ওকাজ হবে না।

বেশ ভালো, তাহলে এই অবস্থাই চলুক। অথচ আমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে ভাব জমিয়ে তালের বড়া খেয়ে এলাম।

আমার মায়ের কাছে? সেটা আবার ভারী একটা শক্ত ব্যাপার নাকি?

সমীর বলে, তুমি যদি আমার মায়ের হাতের ওই তালের বড়ার প্রশংসা করে আসতে, তাহলে দেখতে নেমন্তন্ন চলে আসতো। মা বলতো, তোর সেই বন্ধুর বোনটিকে আর একদিন আসতে বলিসনা রে। বড় খাসা মেয়েটি।

মায়ের কাছে বাজে কথা? আমি তোমার বন্ধুর বোন?

বাঃ নয় কেন? তোমার দাদার সঙ্গে স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলিনি?

ওঃ তাই বুঝি? তা দাদাকেই বল।

পাচ্ছি কোথায় তাকে? সে তো এখন বিগম্যান। বিদেশ থেকে আসে, বড়লোক শ্বশুরের বাসায় ওঠে, ট্যাক্সি চড়ে আসে যায়।

বৌদিটার লাক। আমার এই ভাবেই জীবন যাবে।

আহা থাক। জীবন একেবারে চলে গেল। একটা কাজ করলে হয়—

কী?

আমার সেই প্রতুলমামার আর্জিটার ছুতো করে মাসিমার কাছে হানা দিইগে— সেই সঙ্গে নিজের আর্জিটাও পেশ করে ফেলা যাবে।

বিভার চোখে মুখে খুশীর ফুল ফোটে।

পাত্র হিসেবে আহামরি না হলেও, প্রধান ভরসা সমীররা বামুন। পৈতে অবশ্য পরে

না, তবে 'ভাদুড়ী' যে ব্রাহ্মণ তা বিভা জানে।

বিভা মনে মনে ভেবে নেয়, সহজে হলো তো হলো নচেৎ নিজেই সে আইন হাতে নেবে। বাবার দয়ার উপর পড়ে থাকলে যে কিছু হবে না, তা সে ভালই জানে। ...ঠিক আছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই সামনে পুষ্পকাকা। বিভার ভাগ্যটা বটে! আর এক মিনিট হলেই পথের চলমান জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে পারতো, ধরতে পারা যেত না, কোথায় ঢুকেছিল বিভা।

পুষ্পকাকা যদি জিগ্যেস করে, এ দোকানে কী দরকার রে? তাহলে কী উত্তর দেবে সেইটাই মনে মনে ভাঁজছিল বিভা, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল পুষ্পভূষণ। বলল, তোদের বাড়ি একবার যাব যাব ভাবছি—তা হয়ে উঠছে না। ইয়ে, মেজদার মনটা একটু নরম হয়েছে?

বিভা থতমত খায়।

এটা আবার কোন প্রসঙ্গ।

বলে, কিসের?

ওই আর কি তোদের বাড়ি-ফাড়ির কথা বলছি। বাড়ি আর কী? নোনাধরা ইঁটের স্তূপ বৈ তো নয়। জমিটা নিয়েই কথা। আমার একজন পরিচিত ভদ্রলোক এই অঞ্চলে জমি জমি করে অস্থির হচ্ছেন। আমায় বলছিলেন, অন্তত কাঠাচারেক জমি পেলেও—তা তোদের বাড়ির সামনের জমিটা বোধহয়—

বিভা কষ্টে বেজার গলায় সামলে নিয়ে বলে, তা আমায় বলে কী হবে?

তা জানি। যাব, শক্তিদার কাছেই যাব একদিন। জেনে নিচ্ছিলাম মতি বুদ্ধি একটু ফিরেছে কিনা।

বিভা ফস করে বলে বসে, বাবার? এ জন্মে নয়।

পুষ্পভূষণের মুখে একটা ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে। বলে, সেই তো মজা। সংসারের এই হাল, ছেলেমেয়েদের এই অবস্থা করে রেখেছে, মেজবৌদিকে দেখলে তো দুঃখ হয়, অথচ—

বিভা আস্তে বলে, বলে দেখবেন। তবে স্বয়ং ভগবান এসে বোঝালেও কাজ হবে কিনা সন্দেহ।

এই দৃঢ়তাটা যদি সুপথে লাগাতে পারতো মেজদা। ভদ্রলোকের যেমন ঝোঁক দেখলাম, চারকাঠা জমির জন্যে লাখ দুই পর্যন্ত।

সকালে স্নানের পর একটা ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে মন্দির মার্জনা করছিলেন শক্তি-

ভূষণ। এটিও তাঁর নিত্যকর্ম পদ্ধতির একটি অঙ্গ। মন্দিরের শান বাঁধানো গায়ে এখন ফাট ধরেছে বিস্তর, জায়গায় জায়গায় আগাছার চারা উঁকি দেয়। শক্তিভূষণ সেইগুলি উপড়ে উপড়ে তাদের বৃদ্ধিটা বন্ধ রাখেন, আর সকালবেলা সারাদিনের ধুলোটা মুছে পরিষ্কার করেন। শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা চাপিয়ে গঙ্গাজল ঢেলে আবার দরজাটা তালা বন্ধ করে রেখে দেন। এখন তালাই দেন, দিনকাল খারাপ, পাঁচিল ভেঙে রাস্তা থেকে এক হয়তো কোনো দুষ্টুছেলে ঢুকে পড়ে ঠাকুরটাই নিয়ে পালালো।

বাড়িতে বেল গাছ, বাড়িতেই সামান্য কিছু ফুলটুল, নিয়ম সেবার ত্রুটি হয় না।

মন্দির মার্জনান্তে ঠাকুরের দরজা খুলে, পুজো সেরে এবড়ো-খেবড়ো জমি পার হয়ে দাওয়ায় উঠে এলেন। ফাটা চটা সীমেন্টের চাকলা ওঠা ঢাকা দাওয়ায় আদ্যিকাল থেকে পড়ে থাকা চৌকিটায় বসলেন। তৃপ্ত প্রসন্নমুখ, ভাঙাচোরার কুশ্রীতা চোখে ঠেকে না। চির-অভ্যস্ত দৃশ্যের খাঁজে নিজেকে বসিয়ে নিয়ে শান্ত চোখে তাকান চারদিকে। সব ঠিক আছে, অবিকল অপরিবর্তিত। জন্মাবধি যেমন দেখে আসছেন। ফাটা চটা খাপরি ওঠাই তো দেখে আসছেন জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত। হয়তো আরও কিছু ভেঙেছে, আরো কিছু চাপড়া খসেছে। দেয়ালের নোনাধরা ইট থেকে অবিরত ঝরঝরিয়ে গুড়ো ঝরতে ঝরতে হয়তো আরো অনেক ইট গভীর পর্যন্ত খেয়ে গেছে, তবু পরিতৃপ্তির অসুবিধে কোথায়?…এই তো চৌকীর একটা ধারের দিকে জল ছিটিয়ে মুছে জল খাবার এনে নামিয়েছে শেফালী, ফুল-কাঁসার রেকাবে কয়েক টুকরো কাটা পেঁপে, কয়েক টুকরো পাকা পেয়ারা, দুখানা পরোটা, এতটু আলু চচ্চড়ি।

ফল দুটো বাড়ির গাছের, দাম লাগে নি।

পিছন উঠোনের কোণে একটা কলাগাছে 'কাঁদি' পড়েছে। কড়ে আঙুলের মত ছোট ছোট কলা, তা হোক, ভিটের মাটির রসে পুষ্ট। ক'দিন পরেই কাঁদিটা নামানো যাবে।

রেকাবিটা টেনে নিলেন শক্তিভূষণ।

ঠিক যেমন ভাবে টেনে নিতেন বড় জ্যাঠামশাই। তিনিও ঠিক এইখানে বসে এই রকম বেলায় প্রাতরা শ গ্রহণ করতেন।…এই রকম ফুল-কাঁসার রেকাবে কাটা ফল গরম পরোটা আলুবড়ি, বাড়তির মধ্যে একটু করে মাখন মিশ্রী। বিহ্বল একটা বালক সেই রাজকীয় ভোগের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিঃশ্বাস ফেলতো।… ছোটছেলেদের ব্যবস্থা আলাদা ছিল। তাদের জন্যে পেতলের ঘড়া থেকে বাটিতে বাটিতে মুড়ি ঢালা হতো, তার সঙ্গে একটু করে গুড়। কদাচ নাড়ু-টাড়ু।

দু বেলাই ভাতের পাট। 'রেশন' শব্দটা তখনকার অভিধানে ছিল না, আটা মেখে মেখে রুটি বানাবার শখও কারো ছিল না। কেবলমাত্র জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে রুটি রাত্রে হতো, তার দরুণ দু'চারখানা বাসি যা থাকতো ভাঁটুদা সকালে মেরে দিতো।

জ্যাঠামশাইয়ের জীবনটাই দেখেছেন শক্তিভূষণ, বাবারটা নয়। তাই তাঁর আচরণে বংশের ধারার যে ছাপটা ফুটে ওঠে, সেটা সেই জ্যাঠামশাইয়ের মতই। এই ভাবেই চৌকিতে বসে পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে জলখাবারটি খেতেন জ্যাঠামশাই। ওই ঘের প্রাচীরের বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাকিয়েও দেখতেন না। যদিও তখনই ভটচার্যি বংশের শিকড় ছেঁড়া শুরু হয়ে গেছে।

পুষ্পভূষণ তাঁর মেজ জ্যাঠামশাইয়ের ছোট ছেলে—যে জ্যাঠামশাই বরাবর বাইরে বাইরে কাজ করেছেন। ওরা ওদের ভিটের ভাগ ছেড়ে দিয়ে জমির অংশ নিয়ে ফলাও কারবার করে নিয়েছে।

গাছের পেঁপে মিষ্টির বালাই নেই কাঁচাটে, তবু পরম পরিতৃপ্তিতে কামড় দিচ্ছিলেন শক্তিভূষণ, ভেজানো সদর ঠেলে ঢুকল পুষ্পভূষণ। কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত মুখ।

শক্তিভূষণ হৈ চৈ করে উঠলেন না। শান্তভাবে বললেন, এসো। বসো। সব ভালো তো?

বসবার জায়গা বলতে আলাদা কিছু নেই এখানে। কোনখানেই বা আছে? এই চৌকিটাই শুধু। শক্তিভূষণ পুষ্পভূষণের সোফা সেটি সাজানো ড্রইংরুমের চেহারাটা স্মরণ করলেন না, বললেন বোসো। বসল পুষ্পভূষণ।

আলগা আলগা দুটো কথা বলল, তারপর আসল কথাটায় এলো। সেই বন্ধুর শ্বশুরের আবেদন। যে রকম ঝোঁক চেপেছে টাকায় কার্পণ্য করবে না।

শক্তিভূষণ শান্তভাবেই সবটা শুনে বললেন, তোমার তো অনেক রকম বিজনেস। আজকাল কি আবার জমির দালালীও শুরু করেছ?

শেফালী পুষ্পকে দেখে দু পেয়ালা চা নিয়ে আসছিল, ঠোক্কর খেল ঘরের চৌকাঠে। একেই তো উপকরণবিহীন শুধু চা; নেহাৎ শান্তির বিয়েয় পাওয়া দুটো চায়ের কাপ শান্তির বউ রেখে গেছে, তাই কেউ এলে গেলে কাজে লাগে। তা যাই হোক, অমন মান্যিমান লোকটাকে কীভাবে কথা বলা!

তাড়াতাড়ি কাপ দুটো নামিয়ে দিয়ে শেফালী বলে ওঠে, এ আবার কি কথার ছিরি তোমার? একটা হিত পরামর্শ দিতে এসেছেন ঠাকুরপো—

হিত পরামর্শ? তা বটে!

শক্তিভূষণ বঙ্কিম হাসি হেসে বলেন, কথামালার গল্পের সেই ল্যাজকাটা শেয়ালটি সব শেয়ালকেই হিত পরামর্শ দিয়েছিল!…এ কী আমায় আবার শৌখিন পেয়ালায়

চা কেন ? আমার কাচের গেলাসটা কোথায় গেল? নাও সরাও, ও তোমার ঠাকুর-পোকে দাও।

আরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায় পুষ্পভূষণ।

বলে, চা থাক মেজ বউদি। এইমাত্র খেয়েই আসছি। তবে একটা কথা জেনে রেখো মেজদা, অপরকে অহেতুক অপমান করলেই নিজের মান বাড়ে না। আচ্ছা!

উঠোনে নেমে সদর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ওর এই আচ্ছার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্পর্কচ্ছেদের ইশারা।

পুষ্পভূষণ চলে যাওয়া মাত্রই শেফালী চেঁচিয়ে ওঠে, হল তো ? হল ? খুব মান বাড়ল ? ও জমির দালালী করে তোমার কাছে পয়সা খেতে এসেছিল, না ?··· রাতদিন এ সংসারে হাড়ির হাল দেখছে, তাই সুপরামর্শই দিতে এসেছিল। ঘোচালে তো সম্পর্কটা ? নিকট বলতে ওরাই ছিল কাছাকাছি।

শক্তিভূষণ বললেন, কাছাকাছি থাকলেই কি কাছের মানুষ হয় ? কী হলো আমার কাচের গেলাস ?

পেয়ালায় ঢেলেছি আবার গেলাসে ঢালাঢালি করতে যাব ?

কষ্ট হয় তো থাক। একদিন চা-টা বাদ গেলে কিছু এসে যাবে না।

বাদ যাবে ? ওঃ !

শেফালী প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে চলে যায়।

এই সময় হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে দীপ্তিভূষণ! দীপ্তিভূষণের সর্বাবয়বে এমন একটি মাজা-ঘষা ছাপ যে মনে হচ্ছে ও এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। দীপ্তি-ভূষণের কণ্ঠস্বরেও সেই মাজা-ঘষার ছাপ।

বলল, একদিন কাপে চা খেলে কী হয়।

শক্তিভূষণ ভাবেন নি, এভাবে একটা আক্রমণাত্মক কথা বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে দীপু। কিন্তু তিনি তো আর ঘাবড়াবার ছেলে নয়। বললেন, এ প্রশ্নটা করবার জন্যে এতো কষ্ট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ? কিন্তু ওটা আমার নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কি ?

কাচের গেলাসে চা-টা ঢেলে এনে চোরের মতো এক পাশে দাঁড়াল শেফালী। দীপুর মুখের ভাব ভাল নয়। বাপে ছেলেতে একটা কিছু না বেধে যায়। শেফালীর হয়েছে শাঁখের করাত। ইচ্ছে হয় ছেলেরা শক্তিভূষণের মুখের উপর ন্যায্য কথা শুনিয়ে দিক পটাপট, কিন্তু সেই বলার উপক্রম দেখলেই শেফালীর ভয়ে বুক কাঁপে।

শেফালী দেখল, দীপু ঠোঁটটা কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, ও নিয়ে বলার কিছু নেই। আপনার নীচতা দেখতে দেখতে এক এক সময় অসহ্য

লাগে, তাই না বলে পারা যায় না।
কী ? কী বললে ? আমার নীচতা ?
হ্যাঁ হ্যাঁ ! তাই। আপনার—
দীপুর গলায় একটা ভয়ঙ্কর সুর ঝলসায়, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা অত্যাচার ! দেখে দেখে নিজেকে এ বাড়ির ছেলে ভাবতে ঘৃণায় লজ্জায় মাথা কাটা যায়।
কাকে কি বলছিস দীপু ?
শেফালী ব্যাকুল হয়ে ছেলের পিঠে হাত ঠেকায়। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে, হঠাৎ কী হলো তোর ?
দীপু ঝটকা মেরে মায়ের হাতটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বলে, যাকে যা বলবার ঠিকই বলছি ! হঠাৎ নয় সারা জীবনের প্রতিবাদ, একদিন বার্স্ট করেই। তোমার ওপরও আমার কিছু সহানুভূতি নেই মা। অবিরত নীরবে সহ্য করে করে তুমি একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকের অত্যাচারের স্পৃহাটা বাড়িয়েই চলে চলে শুধু নিজেরই ক্ষতি করনি, আমাদেরও জীবন ধ্বংস করেছ।
শেফালী সামনে বসে থাকা পাথর সদৃশ লোকটার দিকে তাকাতে সাহস পায় না, না তাকিয়ে বলে, নীরবে সহ্য করি আমি ? আজীবনই তো ওই মানুষের জেদ আর খামখেয়ালে জবাই হচ্ছি। তবু চুপ করে সইছি ? দেখতে পাস না রাতদিন চেঁচাচ্ছি।
থামো ! ও চেঁচানোর কী মূল্য হলো, এই আমি আজ আপনার মুখে স্পষ্ট জানতে চাই কেন আপনি ভাববেন পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র আপনি, আর সবাই কুকুর বেড়াল।
শক্তিভূষণ বিচলিত হলো না।
শুধু ভুরু কুঁচকে বলেন, এই কথা ভাবি আমি ?
আলবাৎ ভাবেন। মনে করেন যা কিছু মান সম্মান শুধু আপনারই আছে, আর কারো মান নেই, আত্মসম্মান নেই। যারা আপনার হাতে আছে, আপনি তাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করবেন। করেনও তাই।
আমি তোমাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করি ? না তোমরাই আমার সঙ্গে চাকর বাকরের মত ব্যবহার কর বাবা !
থামুন। বুঝে সুঝে ইয়ে সাজবেন না। উপায় থাকতেও আপনি আমাদের ভিখিরি করে রেখেছেন। লোকের কাছে আমাদের আহাম্মুখ বানিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমাদেরও যে একটা জীবন আছে একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। তা কোনোদিন স্বীকার করেছেন ? আপনি নিজের অহঙ্কারের গজদন্ত মিনারে বসে থেকে আমাদের

দুর্দশা উপভোগ করছেন, আর প্রতিক্ষণ আমাদের অপমান করবার চেষ্টা করছেন।
শেফালী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার বরাবরের স্বল্পভাষী এই ছেলের দিকে। এতো কথা কার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে? দীপুর? এ কোন দীপু? দীপু তার বাপকে অবজ্ঞা করে, হয়তো ঘৃণাও করে তা জানে শেফালী, কিন্তু এতো সাহস হল কী করে? ভীরু শেফালী সাহস দেখলে ভয় পায়, অবাক হয়।
কিন্তু শক্তিভূষণ?
তিনি কি তাঁর ছেলের এই অবিশ্বাস্য স্পর্ধায় বিচলিত হন? তিনি কি চেঁচিয়ে ওঠেন?
নাঃ। অবিচল শক্তিভূষণ অটুট গলায় বলেন, নাটকের যে যে ডায়ালগগুলো মুখস্থ করে এসেছিলে, সব বলা হয়েছে? না আরো কিছু বাকি আছে? থাকে তো বলে যাও।
নাটকের ডায়লগ।
মুখস্থ!
দীপ্তিভূষণ ব্যঙ্গ তিক্ত গলায় বলে, চমৎকার। তা আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন। সারা জীবন তো এই চর্চাই করেছেন। কিসে অন্যকে আঘাত দেওয়া যায়। এতে শুধু চরিত্রের নীচতাই প্রকাশ পায় বুঝলেন? নীচতা নোংরামি, ভণ্ডামি। ছেলেবেলা ত্যাগ বিলাসিতা বর্জন, লোভ শূন্যতা অনেক বড় বড় বুলি শুনিয়েছেন আপনি আমাদের। সে মুখোস খুলে গেছে বুঝলেন?
গেছে বুঝি?
শক্তিভূষণ তেমনি অটুট গলায় বলেন, তা হলে তো বালাই চুকেই গেছে।
চুকে গেছে বললেই চুকে যায় না।
দীপ্তিভূষণ ন্যাজে চাপ পড়া ক্রুদ্ধ অজগরের মত গর্জন করে বলে ওঠে, এতোই যখন ত্যাগের আদর্শবাদ, তখন সংসার করা উচিত হয়নি আপনার। খুশীতে আধ ডজন জীব সৃষ্টি করে বসে—
এখন শক্তিভূষণ উঠে দাঁড়ান।
দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে পাথুরে গলায় বলেন, অনেকক্ষণ বলতে দেওয়া হয়েছে তোমায়, এখন যেতে পারো। না না পরে নয়, যাও। আর কখনো এ দরজা ডিঙোবার চেষ্টা কোরো না বুঝলে? মনে থাকবে?
ঠিক আছে।
বলে তরতর করে সিঁড়ি কটা নেমে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে যায় দীপু।
শেফালী এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে থেকে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে?

জন্মের শোধ তাড়িয়ে দিলে ?

হ্যাঁ দিলাম।

শক্তিভূষণ আত্মস্থ গলায় বলেন, দেহের কোনো অংশে দুষ্ট ক্ষত হলে, সে অংশটা বাদ দেওয়াই বুদ্ধির কাজ।

অতএব বুদ্ধির কাজই করে চলেন শক্তিভূষণ।

করেন, ক'দিন পরেই, আরও একবার।

শক্তিভূষণকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে দোকানী সমীর ভাদুড়ী সাহস সঞ্চয় করে বাইশ নম্বর বাড়িতে ঢুকে আসে। বলাই ছিল, অতএব ঢুকেই বিভাকে দেখতে পায়।

বিভার মুখে আহ্লাদ।

বিভার চোখে কটাক্ষ।

বিভার বুকে আবেগ।

সমীর সেই আবেগ আহ্লাদ কটাক্ষের দিকে তাকিয়ে বলে, উঃ! কখন থেকে যে চেষ্টা করছি। সম্রাট আর দুর্গ ত্যাগ করেনই না। রাস্তা দেখছেন, লোক দেখছেন, থামছেন এগোচ্ছেন। ব্যাপার বুঝলাম না।

বাবার তো ওই রকমই।

বিভা বলে, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একশোবার বাড়ির বাইরের ওই পাঁচিলটাকে দেখবেন, আর দাঁড়াবেন। দেখে আর ফুরোয় না।

তা এতই যদি 'বাড়িপ্রেম', সারান না কেন বাবা ?

এই বাড়ি সারানো ?

বিভা ভ্রুভঙ্গী করে, নতুন চাকরী হতেই দাদা একবার একটা কন্ট্রাক্টারকে ডেকে এনে এস্টিমেট চেয়েছিলেন, লোকটা হেসেছিল। বলেছিল, এ বাড়ি সারানো যায় না। তবে তেমন খেয়াল হলে হাজার চল্লিশ পঞ্চাশ লাগবে। বাবা শুনে ব্যঙ্গ-হাসি হেসে বলেছিল, আচ্ছা বলুন তো মশাই, যেমন আছে রেখে দিলে ভূমিসাৎ হতে কত বছর লাগবে ?

লোকটা বলল, তা কী বলা যায় ? পুরনো বাড়ির খেয়াল। হয়তো দুটো বর্ষাতেই ধ্বসে যেতে পারে। তবে একতলা বাড়ি তো, আছে তো আছেই। নোনা ধরবে ইঁট খসবে ফাটল ধরবে গাছ গজাবে তবুও বছর পনের বিশ টিকেও থাকবে। ...শুনে বাবা একগাল হেসে বলল, পনের বিশ! ওতেই হবে। ওতেই হবে।...বাবার মুখের অমন প্রাণখোলা হাসি দেখিনি কখনো।

তার মানে, উনি ওঁর জীবদ্দশায় এ অবস্থার বদল করবেন না।

বিভা করুণ মুখে বলে, তাই তো মনে হয়। কিন্তু এতো কষ্ট লাগে মাকে দেখলে! সারা জীবন শুধু—যাক মাকে বলে রেখেছি, চলো এই বেলা।

হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো। হঠাৎ আবার কখন আলমগীরের অবির্ভাব ঘটবে, সঙ্গে সঙ্গেই তো বান্দার বিদায় মুহূর্ত।

বিভা বলে, বেশ তো বলছো। কাজটা তা হলে এগোবে কী করে?

আরে বাবা, মা জননীকে দিয়ে খানিকটা এগোনো যাক তো, পরে দেখা যাবে।

প্রথমটা অবশ্য 'প্রভাস মামার' আর্জিটাই পেশ করে সমীর। সেই জমির ব্যাপার।

শেফালী হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ও আশা আর করি না বাবা। ওই মানুষের মাথায় যে কী খেয়াল ঢুকে বসে আছে। সেদিন তো ওনার একভাই, এই তো এই পাশের ম্যানসনের মালিক পুষ্পভূষণবাবু, এই কথাই বলতে এসেছিল, তাকে তো এক রকম অপমান করেই তাঁড়িয়ে দিলেন।

সবই জানে সমীর, তবু বলে, আপত্তিটা কি?

ওই তো ভিটে বেচবো না।

তা ভিটে বাড়িটা থাক না, আশপাশের জমিটা দিতে কী? সামনে পিছনে অনেকটা তো জায়গা!

বলা বৃথা বাবা।

সেদিন একটা দালাল এসে পিছনের জায়গা থেকে এক দেড়কাঠার জন্যই ঝুলোঝুলি করল, ও চলাফেলা গত হয়ে পড়ে রয়েছে, তাতেই পঁচিশ-তিরিশ হাজার দিতে চাইল, প্রায় দূর দূর করেই তাড়িয়ে দিলেন তাকে।

সমীর হেসে ফেলে বলে, তা হলে তো চলবেই না ওকথা। কিন্তু আমার নিজেরও যে একটা আর্জি ছিল মাসিমা। তাতেও দূর দূর হতে হবে না তো?

এই দ্বিতীয় কথাটা বলে রাখেনি বিভা। শুধু সমীরের নতুন মামার গল্পই শুনিয়ে রেখেছিল। বলেনি ভয়ে। যদি মা-ই নাকচ করে দেয়?

শেফালী অতএব অবাক হয়।

তোমার কী?

কী সেটা ধাঁ করে বলে ফেলে সমীর।

মেয়ের তো বিয়ের বয়স হয়েছে, কী রকম পাত্র খুঁজছেন? খুব দামী? না মোটামুটি হলে চলবে?

শেফালী কপালে হাত দিয়ে বলেন, খুব ভালো! হায় কপাল। খুঁজছেই বা কে পাত্তর? ওই তো মানুষ, ডাঁটের ওপর আছেন পণ-টন দেবেন না—আজকের

বাজারে এ জেদ রাখলে চলে ?

সমীর অমায়িক মুখে বলে, চলবে না কেন ? সকলেই কিছু পণ চায় না। আমার হাতেই একটি অবশ্য মোটামুটিই পাত্র আছে, এক পয়সাও দাবি নেই, শুধু মেয়েটি হলেই হলো।

শেফালী বিগলিত গলায় বলে, সত্যি বলছ ? কোথায় কী বৃত্তান্ত আমায় বলে যাও তা হলে—

বিভা জানে, ও বলে দেবে। আমি পালাই। মেসোমশাই এসে যাবেন, ওঁকে দেখলে আমার ভয় করে।

সমীর চলে যেতেই শেফালী অবোধের ভান ত্যাগ করে বলে, এই ছেলেটার সঙ্গেই তা হলে ভাব ভালবাসা চালানো হচ্ছিল ? আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না তুমি ! তা কী জাত ও ?

ব্রাহ্মণ ! ভালো ব্রাহ্মণ !

শেফালী হৃষ্টই হয়।

এক পয়সা দাবি নেই। এটা বোধহয় লওয়াতে পারবেন শক্তিভূষণকে। তাই একটু নিভৃতি খুঁজে পাড়লেন কথাটা।

দেখতে শুনতে ভালো, কাজকর্ম করে, দাবি-দাওয়া কিছু নেই—

শক্তিভূষণ ভুঁরু কুঁচকে বললেন, এতো সব সন্ধান সুলুক দিচ্ছে কে ? ঘটক লাগিয়েছ নাকি ?

শোনো কথা ! আমি আবার তোমার অজ্ঞান্তে কী করছি ? এর ওর মুখে শুনলুম—

শক্তিভূষণ বললেন, তোমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে এ ও সে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে তা হলে ? তা ভালো ! যাক, কী জাত ? মুচি, মুসলমান ? হাড়ি ? ডোম ?

মরি মরি ! কী কথার ছিরি। আমি যেন তাই বলতে আসছি তোমায়। সদ্‌বামুনের ঘরেরই ছেলে ! বাপের নাম ছিল রাজীব মৈত্র, কোর্টে না কোথায় কাজ করতো, মারা গেছে ক' বছর। ছেলের নাম—

শক্তিভূষণ কাটারী নিয়ে একটা বাখারি চাঁচছিলেন, হাত থামিয়েছিলেন, আবার সে কাজে মন দিয়ে বললেন, মৈত্র ? ওদের সঙ্গে আমাদের চলে না।

শেফালী রেগে ওঠে।

কেন, চলবে না কেন ? মৈত্র বামুন নয় ?

বামুন নয়, তা তো বলিনি। বলছি—ওদের সঙ্গে আমাদের চলে না।

এখন আবার অত চল অচল লোকে মানে না কি ?

লোকে কী করে না করে আমার জানা নেই। আমি মানি।

বললেন শক্তিভূষণ।
আর এই বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের আর একটা দুষ্টক্ষতযুক্ত অংশ প্রকাশ পেয়ে গেল এবং বোঝা গেল জায়গাটা যেমন নিভৃত মনে হয়েছিল তেমন ছিল না।
কিন্তু বিভা নামের ওই সর্বসাধ আহ্লাদ বর্জিত মেয়েটা আর কত সহ্য করবে। দিদি ছিল একটা মনের সঙ্গী, চিরনির্বাসন ঘটেছে তার এ বাড়ি থেকে, মেজদার সঙ্গে তেমন যোগ না থাক তবু মেজদা ছিল! তার আসা যাওয়া চলাফেরা সবের মধ্যেই যেন একটা মহিমা মহিমা ভাব ছিল, তাকেও গেট আউট করে দিয়েছে বাবা। দাদার কথা তো বাদই দাও। থাকা না থাকা সমান।
বিভার তবে ভবিষ্যৎ কী?
বিভা যদি হাতের কাছে আসা নৌকোখানা বোকার মত জলে ভেসে যেতে দেয়, আর নৌকো জুটবে তার?
বিভাকে অতএব কোনো একখান থেকে বেরিয়ে এসে বলতে হয়েছে, আপনি অনেক কিছুই মানেন বাবা, মানেন না শুধু আপনার ছেলে মেয়েদেরও একটা মন প্রাণ আছে। যাক—মা, জিজ্ঞেস কর তো বাবাকে বাবার উচ্চকুলের সঙ্গে মেলে এমন উচ্চ ব্রাহ্মণের ঘরের কোনো পাত্র উনি ওঁর মেয়ের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন কিনা।
অতএব শরীরের ক্ষতদুষ্ট অংশকে ত্যাগ করলেন শক্তিভূষণ।
বললেন, মেয়ে সন্তান একবস্ত্রে রাস্তায় বার করে দিলে নিজেরই অপমান। তিন দিন সময় দিলাম আমি, এর মধ্যে যা ব্যবস্থা করবার করে নাও। মনে রেখো তিন দিন পরে এই বাইশ নম্বর বাড়িতে আর এক ঘণ্টাও নয়।
এবার আর কেঁদে উঠলো না শেফালী।
শুধু ভয়ানক একটা শূন্য গলায় বলল, একে একে তা হলে সবাইকেই তাড়াবে তুমি?
দরকার হলে করতেই হবে তা।
তবে দাও, আমাকেও তাড়িয়ে দাও। আমি আর এই শূন্য প্রেতপুরীতে টিকতে পারবো না।
না পারো অনায়াসে কোনো পুণ্য পুরীতে চলে যেতে পারো। ভাইয়ের বাড়ি আছে, ছেলের বাড়ি আছে।
এর পর আর কোন্ অভিমানের কান্না কাঁদতে যাবে শেফালী?
শেফালী অতএব যথারীতি সকালে উঠে দেওয়ালের কোলে কোলে ঝরে পড়া ইটের নোনা ঝাঁট দিয়ে দিয়ে এই বৃহৎ বাড়িটা পরিষ্কার করছে, কয়লা ভাঙছে কাঠ

কাটছে উনুন ধরাচ্ছে রান্না চাপাচ্ছে। শুধু উনুনটা ধরাবার সময় 'বড়টা আর কী হবে', বলে ছোট উনুনটা ধরাচ্ছে। আর বড় হাঁড়িটা সরিয়ে রেখে ছোট হাঁড়িটায় ভাত চাপাচ্ছে।

কিন্তু ছোটটাও যে বড় হয়ে দাঁড়াবে, তা কি ভেবেছিল শেফালী? ভেবেছিল কি তিপু নামের সাদাসিধে ছেলেটার মধ্যেও এতো দুষ্টুমি ঢুকে বসেছিল?

মেজদার জামা প্যান্ট ভরা স্যুটকেসটা, আর মায়ের গলার হার এবং বাবার বাক্সের কিছু টাকা হাতিয়ে কেটে পড়বে সে ভাগ্যান্বেষণে? চিঠি লিখে রেখে গেছে খুঁজতে বারণ করে। লিখেছে—বাবা তাঁর ভিটের মাটি কামড়ে পড়ে থাকুন, তাঁর উপর আর কোনো আশা রাখি না। মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তো এসে সব ঋণ শোধ দেব। না ফিরি, মনে কোরো বাইরের চোর চুরি করে নিয়ে গেছে।

শেফালী কোনো কথা বলেনি, চিঠিটা শক্তিভূষণের সামনে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

একটু পরে শক্তিভূষণ প্রায় কখনো যা করেন নি, তাই করলেন। চিঠিটায় চোখ বুলোতে বুলোতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, শেফালী দেবীর বি এ পাশ মেজছেলের থেকে স্কুল ফাইন্যাল ফেল কনিষ্ঠ পুত্রটি তো দেখছি অনেক চালাক! আখের গুছোবার বুদ্ধি আছে।

শেফালী কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে যাওয়া চোখ দুটো তুলে বলে, তোমার প্রাণটা রক্ত-মাংসর না লোহার?

বোধহয় তাই।

শক্তিভূষণ বলেন, ভয় নেই, এই আখের গোছানোরা সত্যি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় না। দেখো—দু'দিন পরেই এই পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে এসে পিঁড়ি পেতে বসে যাবে। মাতৃস্নেহের বহরটা তো জানে।

শেফালী এখন ভগবানের কাছে কোন্ প্রার্থনা করবে? ওই চণ্ডালচিত্ত লোকটার মুখ মাথা হেঁট করতে জীবনে না ফিরে আসুক তিপু। না কি প্রার্থনা করবে, 'হে ঠাকুর ওর কথাই যেন সত্যি হয়?

ঠিক করতে পারে না শেফালী তাই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলে, একটা পিশাচের সঙ্গে ঘর করে এলাম আমি চিরদিন। একটা পিশাচের সঙ্গে।

শক্তিভূষণ বললেন, সে তো চিরকালই জানছো। তবে একটু সামলে নিয়ে দেখো, বাছাধন আর কী কী হাতিয়ে নিয়ে কেটেছেন।

শেফালী মনে মনে বলে, বোকা! বোকা! পয়লা নম্বরের বোকা একটা। আমার পেটের সন্তান তো, আর কত বুদ্ধি হবে? কী দরকার ছিল তোর চিঠিতে কবুল

করবার, মা ট্রাঙ্ক থেকে তোমার হারটা নিয়ে যাচ্ছি। আমি কি ওই নির্দয়কে বলতে যেতুম। তুই আসিসনে, আসিসনে, ওর উঁচু নাক ভোঁতা হোক!

আবার শেফালী প্রতি মুহূর্তে কান খাড়া করে থাকে, রান্নাঘরের পিছনের উঠোনের ছোট দরজাটায় টোকা পড়ার শব্দ হল কি না। তপু ওর বন্ধু ছিল, ওকে হয়তো কিছু বলে গেছে। কিন্তু যাবে কী করে? ওই দাম্ভিক মানুষটা কি তাহলে আস্ত রাখবে শেফালীকে? মাতৃহৃদয়ে, হাহাকার বুঝবে না, মান খোওয়ানোর অপমানটা বুঝবে।

শান্তিভূষণকে কেউ খবর দেয়নি, তবু বাতাসে বার্তা রটে। চলে এলো একদিন। মায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, তিপু না কি চলে গেছে বাড়ি থেকে?

শেফালী দুটো হাঁটু উঁচু করে বসেছিল, তার মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু শক্তিভূষণও যে শান্তির সঙ্গে সঙ্গে ভিতর বাড়িতে ঢুকে এসেছেন। তিনি বলে ওঠেন, হ্যাঁ কিছু হাতিয়ে-টাতিয়ে ঘটা করে চিঠি লিখে চলে গেছেন। কিন্তু তুমি থামবে? একটা চোর ছেলের জন্যে, একটা বেহেড মেয়ের জন্যে রাত দিন প্যান-প্যানানি। অসহ্য। তোমার মেজ বোনটিও যে একটা লাভার জুটিয়ে পথ দেখেছেন শোন নি?

শুনেছে সবই শান্তিভূষণ!

পুষ্প কাকার সঙ্গে তার কোনো কোনো বিজনেস জনিত যোগাযোগ আছে। শুকনো গলায় বলে, শুনেছি ইলেকট্রিকের দোকানের সমীরকে বিয়ে করেছে। চিনতাম ছেলেটাকে।

বিয়ে! তা হবে।

শক্তিভূষণ বলেন, গল্প জানতো, খড়িগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছি বলে দু বাহু তুলে আহ্লাদ? এও তাই! ভাবো বোনের বিয়ে হয়েছে। আমার মতে এ হচ্ছে কুল-ত্যাগ, বুঝলে? কুলত্যাগ।

শান্তিভূষণ একথার আর কী উত্তর দেবে? মনে মনে বলে তুমি যদি দুই চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে সূর্যকে অস্বীকার কর, সূর্যের কিছুই এসে যাবে না। সমাজ কোথায় দৌড় দিচ্ছে তাকিয়ে দেখছ না, দুশো বছরের পুরনো ইঁটের খাঁচার মধ্যে বসে কোন্ কালে শেখা 'হরেকেষ্ট' বুলি আওড়াচ্ছো।

মনের কথা মন থেকে আপনি বেরোয় না এই রক্ষে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, দীপুও তো আজকাল আর এখানে থাকে না?

'থাকে না' নয়, তাড়িয়ে দিয়েছি। ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছি।

শেফালী ছেলের জন্যে চা তৈরী করতে উঠে যাচ্ছিল, তীব্র গলায় বলে গেল,

বাহাদুরীটা ফলাও করে বল বসে বসে।

শান্তিভূষণ দুঃখের গলায় বলে, অদ্ভুত এক আদর্শ আদর্শ করে নিজেও কোনোদিন সুখ পেলেন না, অন্যকেও কোনোদিন সুখ পেতে দিলেন না।

শক্তিভূষণ বসেছিলেন চৌকিতে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সুখ পেলাম না' এটা কী করে জেনে ফেললে?

শান্তিভূষণ একটু থামল, একটু হাসল।

সেও এখন মস্তবড় হয়ে গেছে, অত্মস্থ হতে শিখেছে। আর সে স্থির করে এসেছে বাবার ইচ্ছাকৃত অপমান গায়ে মাখবে না। তাই হেসে বলে, জেনে ফেলিনি, ধারণা মাত্র। অন্যকে যে পেতে দিলেন না সেটা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারেন না?

শক্তিভূষণ শান্ত গলায় বললেন, আমার সাত পুরুষের ভিটেমাটি বেচে অন্যের বিলাসিতার খরচ জোগাতে না পারাটা যদি তাদের অসুখী করা হয় তা করেছি অবশ্যই।

শেফালী চা নিয়ে এসে নামাল।

শুনল কথাটা।

বলল, বিলাসিতা? তা বলবে একদিনের জন্যে দুটো ভালো খেতে পর্যন্ত—

চুপ করে গেল।

শক্ত হয়ে বসল শান্তিভূষণ।

অথচ শান্ত গলায় বলল, আপনি আমাদের যতই অগ্রাহ্য করুন, আমি আপনার বড় ছেলে, আমার কথাটা একটু শোনবার চেষ্টা করবেন। আমি বলছি এখনো জমির দর চড়চড়িয়ে চড়ছে, কিন্তু বরাবর একরকম যায় না। পিছন দিকে দু তিন কাঠা নিজেদের মতো রেখে—

শক্তিভূষণও গম্ভীর গলায় বললেন, সামনেটা বেচে দেবো? আর এই মন্দির?

শান্তিভূষণ ওই মন্দিরের দিকে একটু অবহেলায় দৃষ্টিপাত করে বলে, মন্দিরের যা অবস্থা, তাতে তো—বেশ তো পিছন দিকে না হয় আর একটা ভালো করে বানিয়ে নেবেন। টাকার অসুবিধে না থাকলে আর—

শক্তিভূষণ তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলেন, তুমি তোমার এই ভাঙাচোরা মাটিকে ফেলে দিয়ে আর একটি নতুন মা বানিয়ে নিতে পারো?

শান্তিভূষণ আহত গলায় বলে, আপনি তো সকলকে আঘাত করতেই বদ্ধপরিকর। এটাই আপনার আদর্শ। চিরদিন মৃতের মর্যাদা দিতে গিয়ে জীবিতদের তাকিয়ে দেখলেন না। কিন্তু আমি বলব, ওসব ভক্তিটক্তি সত্যি নয়। আসলে আপনি চিরদিন শুধু নিজেকেই ভালবেসেছেন।…

আরে কথাটা তোমার মেজ ভাইয়ের কাছে শিখে এলে নাকি ?

শক্তিভূষণ হেসে ওঠেন, সে একটা ফচকে ছেলে, আর তুমি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি—

সত্যি কথা কারুর কাছে শিখতে হয় না বাবা। চিরদিন আপনি যে অন্যায় করে এসেছেন—

চিরদিন আমি অন্যায় করে এসেছি ?

করেছেন কিনা নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন। তবু বলছি—এখনো সময় আছে। এখনো যদি—

শান্তি, তোমার বোধহয় ট্রেনের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

শান্তি আরক্ত মুখে বলে, সেটা আমি বুঝবো বাবা! তবে এততেও আপনার শিক্ষা হল না, এই আশ্চর্য।

শান্তি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—বসে বসে একটা ঘুষখোর বাজে লোকের এতো বাচালতা শোনবার ধৈর্য আমার নেই।

শরীরের আর একটা ক্ষতদুষ্ট অঙ্গ কেটে বাদ দেন শক্তিভূষণ।

ওঃ! আচ্ছা।

শান্তি উঠে দাঁড়ায়।

তার মানে শেফালীর পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও সরে যাচ্ছে। শেফালীর মাথার ওপরকার ছাদ ভূমিকম্পে নেমে আসছে। শেফালী চেঁচিয়ে উঠে বলে, শান্তি বুঝতে পারছিস না, ও পাগল হয়ে গেছে। পাগলটাকে বেঁধে রেখে তোরা যা ভালো বুঝিস কর। আর সহ্য করতে পারছি না আমি। আমি তোর মা আমিও গুরুজন, আমি বলছি ওকে গারদে দে।

শান্তিভূষণ কিছু বলে না।

আস্তে খুলে রাখা জামাটা গায়ে পরে নেয়। জুতোটা পায়ে গলায়, শেফালী ছুটে এসে ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, তবে তুই আমায় সঙ্গে নিয়ে যা। আমি চলে যাব, আমি চলে যাব। আমি আর পারছি না।

কিন্তু চলে যাব বললেই কি চলে যাওয়া যায় ?

শান্তিভূষণ তো আর পাগল হয়ে যায়নি, যে বিনা নোটিশে হঠাৎ মাকে নিয়ে গিয়ে বউয়ের ঘাড়ে চাপাবে ?

কই নিয়ে গেলো না ছেলে ?

শক্তিভূষণ মৃদুমন্দ হেসে বলেন, আমি তো পাগল ছাগল, তোমার ছেলেরা তো

ভালো ভালো—

কিন্তু এখন তো বাড়ি সব সময় নির্জন।

এতো বড় বাড়িতে শুধু তো শেফালী আর বছর আষ্টেকের খুকুটা। শক্তিভূষণের কথা বাদ দাও। তিনি তো বারবাড়ির মানুষ। খুকুর চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ? দুপুরটায় সে তো একটা স্কুলেও যায়।

তবে কেন শেফালী রান্নাঘরের ছাদের ওই লোহার আংটাগুলোর একটা কাজে লাগায় না? এখনো কেন শেফালী সকালে উঠে ঠুকঠুক করে কয়লা ভাঙে, কাঠ কাটে, উনুন ধরায়? বাটি করে একটু চাল ধুয়ে ভাত চড়ায় কুটনো কোটে বাটনা বাটে চায়ের জল চাপিয়ে পরোটার জন্যে ময়দা মাখে? শেফালীর নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

অতএব শক্তিভূষণেরও ব্যতিক্রমের প্রশ্ন নেই।

তিনি যথারীতি সকালে উঠে 'বাগান' দেখেন, মন্দির মার্জনা করেন, শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ান। তারপর ধীরেসুস্থে এসে তার জ্যাঠামশায়ের জায়গায় বসে ফুল কাঁসার রেকাবে করে কাঁচাটে পাকা পেঁপে, দরকোচা কলা, জোলো জোলো পাকা পেয়ারার টুকরোর সঙ্গে গরম পরোটা আর আলুচচ্চড়ি খেতে খেতে পল্লবিত গাছপালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কোন বিস্মৃত অতীতে চলে যান।

সদর দরজাটা খোলাই পড়ে থাকে, দাওয়ায় চৌকিতে বসে বসেই রাস্তার চলমান জনস্রোতের দৃশ্য দেখা যায়। বাজারের পথ। ও প্রান্ত থেকে লোক আসছে। একটুক্ষণ দেখা যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার এ প্রান্ত থেকে লোক যাচ্ছে, একটুক্ষণ দেখা যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই, হয়তো নিত্য মুখোমুখি হওয়া বাবদ একটু পরিচয় ঘটে, দুটো কথা হয়। হয়তো তারও সময় নেই।

শুধু যতক্ষণ এরা একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ওদের বলা হচ্ছে 'সহযাত্রী'।

হঠাৎ যেন ভারী অবাক লাগে শক্তিভূষণের। এভাবে তো কোনোদিন ভেবে দেখিনি। সত্যি এরা কি সকলে একসঙ্গে পরামর্শ করে রাস্তায় বেরিয়েছিল? অবশ্যই নয়। এরা কেউ কারো মতো নয়। পথ ওদের একটুক্ষণের জন্য কাছাকাছি আনছে আবার কে কোথায় চলে যাচ্ছে।

তবে কেন আশা করবো, যারা কাছাকাছি হাঁটছে তারা আমার মতো হবে?

এই দাওয়ার চৌকিটায় একদা আমার জ্যাঠামশাই বসতেন, আর বসলেন না। আমি এখন বসে আছি, হঠাৎ কোনোদিন আর বসব না।…এই জমির টুকরোটা নিয়ে সারাজীবন কত আস্ফালন করলাম, 'আমার জিনিস' আমি যা খুশী করবো।… হয়তো কালই এটা আর 'আমার জিনিস' থাকবে না। আর কেউ এটা নিয়ে যা

খুশী করবে। পাবার অধিকার পাবে।

ভাবতে ভাবতে ক্রমশই অবাক হতে থাকেন শক্তিভূষণ।…অবাক হতে হতে বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ ধরতে থাকে!…অনেকগুলো সহযাত্রীর মুখ চোখের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায়। কী যেন নাম ওদের?

আস্তে চৌকিটার উপর শুয়ে পড়েন।

আধখাওয়া চায়ের গ্লাসটায় একটা মাছি পড়ে ভাসতে থাকে।…

খবরটা রটল অনেক পরে।

শেফালী যখন ভাত বেড়ে ডাকতে এলো তখন জানতে পারল।

বাজারের পথ, খোলা দরজা, ভিড় হলো বইকি। যথেচ্ছ ভিড় হলো।…শক্তিভূষণের সেই সহযাত্রীরাও সকলেই কেমন করে যেন এসে পড়ল। যাদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন তখন শক্তিভূষণ।…

কী যেন নাম ওদের?

শোভা? বিভা? শান্তিভূষণ? দীপু? তিপু। তিপু তো ভাগ্যান্বেষণে তার দাদার বাড়ি গিয়ে উঠেছিল, একসঙ্গেই এসে গেল।

কিন্তু শেফালী তো ওদের জন্যে হাহাকার করে মরছিল। তবে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে না কেন? অনেকদিন না দেখে কি চিনতে পারছে না? চিনতে পারার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না শেফালীর চোখে!

ওরাও অবশ্য সে দৃষ্টির অভাবটা তেমন টের পাচ্ছে না। ওরা অনেক দিন পরে একত্র হয়েছে। ওরা হৈ চৈ করছে, কলকোলাহল করছে। খানিকটা কাঁদছে, অনেকটা হাসি গল্প করছে। আর প্ল্যান করছে সবটা বেচে দিয়ে যে যার ভাগ নিয়ে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী জায়গায় সেট্‌ল করাই সুবিধে, না এইখানের কোনো একটু অংশে দু'একটা ঘর তুলে মাঝে মাঝে পারিবারিক সম্মেলনের একটা জায়গা রাখা!…মেয়েরা বলছে, আহা যতই হোক, চিরকালের পাড়া, মায়া মায়া লাগছে একটু, ওটা হলে মন্দ হয় না। ছেলেরা বলছে, ওর কোনো মানে হয় না।… দু কাঠা রাখা মানেই লাখখানেক হারানো।

এরই ফাঁকে ফাঁকে শ্রাদ্ধের আয়োজনও চলছে বইকি।…চিরদিন ভাঙা তক্তপোষে শুয়ে গেছেন বাবা, ষোড়শে একটা ভালো খাট দেওয়া হোক।…চিরদিন নিজেকে বঞ্চিত করে গেছেন, ব্রাহ্মণভোজনে ভালো করে খাওয়ানো হোক।

শক্তিভূষণের ছেলেমেয়েরা যে বাবাকে ভালবাসতো না, এটা ভুল।

কিন্তু শেফালীর কেন এতে কৃতজ্ঞতাবোধ নেই? থাকা তো উচিত ছিল? বাবা তো ওদের কিছুই করেনি। অথচ ওরা বাবার জন্যে এতোটা করছে! বাবার অংশীদার হিসেবে শেফালীর কৃতজ্ঞ হওয়া খুব উচিত ছিল।

অথচ দ্যাখো—

অংশীদার যে, সে হুঁশটি যে টনটনে রয়েছে। সেটি তো দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে?

আচমকা ধাক্কায় মা একটু আপসেট হয়ে পড়েছে ভেবে, মাসিকে এনে কজেকর্ম চুকে যেতেও বলে কয়ে রেখেছিল ক'দিন। মাসি আর থাকতে পারছেন না। বললেন, আমায় তো এবার ছাড়তে হয় বাবা শান্তি।

শান্তির হয়ে বউ বলে উঠল, আর দুটো দিন থাকুন মাসিমা, মার ওই ইয়ের খাওয়া-দাওয়া, আমরা তো এখন, ঠিক—মানে সোমবারেই তো আমরা মাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছ?

মাসি বললেন, তবে যে শিউলী বলছিল ও এখানেই থাকবে। যাবে না কোথাও।

ও মা। এখানে থাকবেন কী? কার কাছে থাকবেন?—না না, ও ইয়ে করে বলেছেন।

অর্থাৎ মনের আক্ষেপে।

কিন্তু মন নিয়ে তো আর বাস্তব জগৎ চলে না।

শান্তি মায়ের কথা নস্যাৎ করে দিয়ে থাকবে কী বল! পাগল? অসম্ভব কথা বলছ কেন?

শেফালী বলল, অসম্ভব কিছুই নয়। চিরকালের জায়গা, চিরচেনা পড়শি তনুরা রয়েছে। শুধু ইভাকে তোর কাছে নিয়ে যা, ভালো ইস্কুলে ভর্তি করে দিস।

আর তুমি এখানে একা থাকবে?

একা কেন শান্তি? তিনি তো এ মাটি ছেড়ে চলে যাননি! এখানেই আছেন।

এই সব সেন্টিমেন্টাল কথার তো কোনো মানে হয় না মা।

শান্তি বলে, এ সব তো বেচে দেওয়াই ঠিক করা হচ্ছে, এর মাঝখানে ক'দিন আর—

বেচে দেওয়াই ঠিক করা হচ্ছে!

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে শেফালী।

এ সম্পত্তির অর্ধেকের অংশীদার শেফালী দেবী, তা জানো বোধ হয়? যখন তোমাদের অন্য শরিকদের সঙ্গে সেটেল করা হয়, তখন আমার নামটা বসানো হয়েছিল। হয়েছিল। তা শান্তি ভালই জানে।

জানে, শোভা বিভা দীপু আর তিপু শুনল এখন।

কেউ ভাবেনি, তাদের বোকাসোকা হাউড়ে মা আবার হঠাৎ এমন শক্ত ভূমিতে পা দিয়ে দাঁড়াবে।

বলল, জানবো না কেন, জানি। এও জানি—তুমি চিরকালই এ সব বিক্রি করারই সপক্ষে।...তুমি অবশ্যই সই দেবে।

নাঃ। আমি সই দেব না।

শেফালী বলে ওঠে, আমি যতদিন আছি যেমন আছে থাক।

তুমি যতক্ষণ আছো!

দীপু মৃদু হেসে বলে, বয়েসটা নিশ্চয় আশির কাছে পৌছয়নি?

তা সে যেখানেই পৌছক। ইভার ভার নিতে তোমরা কেউ রাজি না থাক, থাকবে আমার কাছে। ওরও একটা পুরো ভাগ আছে তো।

তুমি এভাবে কথা বলছ কেন মা?...মনে হচ্ছে আমরা যেন তোমার প্রতিপক্ষ।

বালাই ষাট। তা কেন হতে যাবি?...আসল কথা কি জানিস বাবা, এতো দিনে বুঝতে পারছি, কেন তিনি সারাজীবন লড়ালড়ি করেছেন।...আমিও কম করিনি। এখন বুঝতে পারছি কোথায় তাঁর বাধা ছিল।...এখন ভাবতে পারছি না, এই জায়গা যেখানে তিনি ঘুরেছেন ফিরেছেন খেয়েছেন শুয়েছেন চায়ের গেলাস নামিয়ে রেখে চিরকালের মতো শুয়ে পড়েছেন। সেই সব জায়গা রোলার চালিয়ে গুঁড়ো করবে। শাবল ঠুকবে। গাঁইতি বসাবে। আমার শাশুড়ির ওই মন্দির উড়িয়ে দিয়ে এখানে ইমারত বসবে। আর আমার দিদি শাশুড়ির রান্নাঘরে—

শান্তিভূষণের বউ বরের হাল ধরে।

বলে, ও সব ভালো ভালো কথা তো আগে কখনো শুনিনি মা আপনার মুখে!

শেফালী বলে, শান্তির কথাটা শান্তিকেই বলতে দাও বউমা।

বেশ বলছি তাই—শান্তি বলে, তার মানে এটাই তো দাঁড়াচ্ছে, বাবা চিরকাল যা করে এসেছেন, তুমিও তাই করতে চাইছ।

আমি যত দিন আছি, তাই চাইছি বাবা।...

তার মানে সেই অভাব, সেই দারিদ্র্য, সেই দুর্দশা?

আরে বাবা, জীবনটা তো কেটেই গেল। তার নতুন করে কোন্ দশা পাবো?

দীপু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তোমার জীবনটা না হয় গেল। কিন্তু আরও জীবন আছে। রাতদিন তো তাদের জন্যে কান্নাকাটি করেছ।

শেফালী তাকিয়ে দেখে মুখগুলোর দিকে। সত্যিই বটে একদা এই মুখগুলোর মুখে হাসি ফোটাবার বাসনাতেই প্রাণ ফেটে গেছে তার।

কিন্তু সে কি অনেক দিন আগে ?

তা নইলে সেই অনুভূতিটা কোথায় ?…ওদের সঙ্গে কবে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল শেফালী ? ওরা যেন অনেক দূরের মানুষ। মুখগুলো যেন অচেনা অচেনা।

শুধু যে মুখটা এখানে অনুপস্থিত—

শেফালী হঠাৎ তাকে বুঝতে পারল।

শেফালী শক্ত হয়ে তাকাল।

বলল, কোন্‌টা যে কখন বড় হয়ে ওঠে, আর কোন্‌টা কখন ছোট হয়ে যায়, নিজেই কি জানে মানুষ ? এক সময় এই বাইশ নম্বর বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় লাঠালাঠি করেছি। এখন আর মরবার আগে এ দরজা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবতেই পারছি না। এখন এ বাড়ির বাইরে আমি কে ? আমার অস্তিত্ব কোথায় ?

শেফালীর ছেলেমেয়েদের ধারণা ছিল না তাদের মা 'অস্তিত্ব' শব্দটার মানে জানে, বানান জানে, উচ্চারণ জানে। আচমকা এই জানাটা দেখে ভারী রেগে গেল তারা।…ওই জানাটার জন্যেই না তাদের সমবেত পরিকল্পনা অতএব ভেস্তে গেল।

খুব রেগে গিয়ে চলে গেল সবাই !

'এ বাড়ির বাইরে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই।'

কী নির্লজ্জ কথা।

শান্তিভূষণবাবুর মা, এটা একটা পরিচয় নয় ? তবে থাকো একা এই প্রেতপুরীতে। অস্তিত্ব ধুয়ে ধুয়ে জল খাও।…কারো এতো সময় নেই যে, তোমায় যখন তখন দেখতে আসবে।…কারুর এতো টাকা নেই যে মনিঅর্ডার করে করে তোমার নিশ্চিন্ত সুরাহার ব্যবস্থা বজায় রাখবে।

কাজেই ধরে নিতে হবে, এর পর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া একটি নামের অযোগ্য মহিলা এই বাইশ নম্বর টিয়াবাগানের অভিশপ্ত প্রেতপুরীর মধ্যে বসে বসে অস্তিত্ব বজায়ের লড়াই করে চলবে।…হয়তো মাটি খুঁড়বে, শাক বুনবে, ঠুকঠুক করে কয়লা ভাঙবে, কাঠ কাটবে, গুল দেবে, ঘাস খেতে আসা গরুদের গোবরগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঘুঁটে দেবে, জ্বালানি কেনার মতো বিলাসিতা করবে না কোনোদিন। গাছে ফলটল ধরলে রান্নাটায় ছুটি নেবে, ঝি গোয়ালা ধোবা এসব নাম ভুলে যাবে, আর পাড়ার কেউ বেড়াতে এসে যখন বলবে, শুধু শুধু এতো কষ্ট করছো কেন বাবা, খেটে সারা হচ্ছো, চলে যাও না ছেলের বাসায়। সেখানে কত সুখ, তখন গৌরব গৌরব মুখে বলবে সে তো একশবার ! ছেলেও তো নিয়ে যেতে ব্যস্ত, সাত পুরুষের ভিটে,

যে কটা দিন সাঁঝ সন্ধ্যে দিতে পারি। মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা রয়েছেন তাঁর ফুলজল দেওয়া আছে, লক্ষ্মীর ঘটে অর্ঘ্য দেওয়া আছে।

আর যখন দরজার বাইরে থেকে পিয়ন কি ভোট চাইতে আসা লোক জিগ্যেস করে উঠবে শেফালী ভট্টাচার্য্য বলে কেউ থাকেন এখানে ?···

তখন মুখটা আরো গৌরব গৌরব করে বেরিয়ে এসে বলবে, হ্যাঁ আছেন। এই যে আমিই শেফালী ভট্টাচার্য! কী দরকার বলুন ? নোটিশটা সই করে নিতে হবে ? দাঁড়ান কলমটা নিয়ে আসি—

দ্বিতীয় পর্ব

তোমার এই ছেলেটিই ডোবাবে আমাদের, তা বলে রাখছি তোমায়।

বাস স্ট্যাণ্ডে ছাউনি নেই, মুখের ওপর রোদ এসে লাগছে একটা তেরছা ছুরির মতো, মুখটা লালচে হয়ে উঠছে, সেই মুখটা আরো গনগনে হয়ে ওঠে এই চাপা আক্রোশের আক্ষেপে। যদিও বাস স্ট্যাণ্ডে শতলোকের ভীড়, তবু এখানেই নিশ্চিন্ততা। ভীড়ে কে কার কড়ি ধারে? কে কার কথায় কান দেয়? অথবা হঠাৎ ঠিকরে ওঠা কোনো কথার বিদ্যুৎ-ছটা, অথবা বাক্যাংশের একটা ছিটকে ওঠা ঢিল থেকে, কথার বিষয়বস্তুর সমগ্র ইতিহাসটা ধরে ফেলবে এমন ভয়ানক চতুর ব্যক্তিই বা পথে ঘাটে এত ঘুরছে কোথায়? 'প্রেমের' ব্যাপার-ট্যাপারগুলো অবশ্য আলাদা। সে তো কথা না ঝলসালেও বোঝা যায়। শুধু পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া দেখলেও বোঝা যায় কে কার প্রেমিকা। কে কার প্রেমিক। অতএব তাদের টুকটাক কথায় কান দেয়। কিন্তু এই সব অপ্রেমের কথায় কেউ কান দেবে না। কাজেই যা কিছু তীব্র বক্তব্য অমিতার এই বাস স্ট্যাণ্ডে আসার সময়টুকুতে এবং বাসের জন্যে অপেক্ষা করার সময়টাতে।

বাড়িতে অবাধ বাক স্বাধীনতার পরিস্থিতি কোথায়? ওই প্রৌঢ় দম্পতি কি বাড়ি ছেড়ে নড়েন কোথাও দু'দণ্ডের জন্যে? কর্তাটি অবশ্য ঠক ঠক করে বেরোন চৌদ্দবার শখে ইচ্ছেয়, গিন্নীর ফরমাস খাটতে, গিন্নীটি তো অনড় অচল। সংসারটাকে যেন শুধু দুহাতে আগলে রেখেও আশা মেটে না, দশটা হাত থাকলেই ভাল হতো এমন আগ্রাসী ভঙ্গী!

অমিতার কি কোনোদিন ইচ্ছে হতে পারে না ছেলেটা স্কুলে যাবার সময় ওর খাওয়াটা দেখি, কি টিফিনটা গুছিয়ে দিই। হবে কোথা থেকে? ছেলের স্নেহময়ী ঠাকুমা ছুটে এসে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, থাক্ থাক্ বৌমা, ও আমি দেখছি। তুমিও তো অফিস যাবে!

হ্যাঁ, এই একটা অসুবিধে। অফিস যেতে হয় অমিতাকে সারাটা দিনের মতো। অতএব ওনার মুঠো থেকে সংসারাটাকে নিজের মুঠোয় এনে ফেলবার ফাঁক নেই।

অমিতার পিসতুতো দিদি লাবণ্য বলে, তুই বাবা খুব লাকী! বরের সঙ্গে বরের অফিসেই চাকরী, বাড়া ভাত খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়িস, ফিরে এসেই হাতে তৈরী চা, পছন্দসই টাটকা গরম জলখাবার! সারাটা দিন সংসারের ঝামেলা পোহাতে হয় না, ছেলেটার জন্যে চিন্তা করতে হয় না। তোর ওই শ্বশুর শাশুড়ী দুটি তো ছেলে ছেলের বৌয়ের সেবার জন্যে একপায়ে খাড়া। এ রকম বাবা দেখা যায় না। ছেলেকে আর বৌকে সমান পর্যায়ে যত্ন-আত্তি। সাধে বলি লাক্!

লাবুদির কথা শুনলে গা জ্বলে যায় অমিতার। আগে অমিতা লাবুকে কত ভালবাসতো, এখন ও এলেই অমিতার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এসেই খালি 'মাসিমা মাসিমা মেসোমশাই মেসোমশাই! আপনারা কী ভালো!' কী ভালো। এতো কী! বলতে তো পারে না অমিতা ওনাদের ওই যত্ন-আত্তি, সর্বদা একপায়ে খাড়ার মূলে কী আছে। লাবুদি একেবারে যে বিরোধী পক্ষ সমর্থক ওরা। বলতে গেলে অমিতাকেই 'ছোট মন' ভাববে। হুঃ! নিজে শ্বশুর-শাশুড়ীহীন ঘরে বৌ হয়ে এসে কনে বেলা থেকেই সর্বেসর্বা, তুমি আর কী বুঝবে, অমিতার মধ্যে কী জ্বালা। নিজের সংসারে, নিজে কুটুম। 'আহা আহা, তুমি কেন? তুমি কেন? তুমি বোসো তুমি বোসো।' ···মায়া! স্নেহ! হুঁ। বুঝতে আর বাকি নেই অমিতার। গদিটি সামলাতেই এতো খাটা ওনাদের। অনেকদিন থেকেই অমিতা অনুধাবন করছে। এই পলিটিকসটি বুঝতে পারে অমিতার মা। বলতে গেলে মা-ই এতোটা চোখ খুলে দিয়েছে। মার সহানুভূতির দৃষ্টি থেকেই অমিতা টের পেয়েছে, সংসারে তার ভূমিকা একেবারে অনধিকারিণীর।

অথচ? অথচ সম্পূর্ণ অধিকারটি তো তারই হবার কথা। তার বরই বাড়ি ভাড়া জোগাচ্ছে, সংসার খরচ চালাচ্ছে, কাজের লোকের মাইনে গুণছে, কী নয়? লোক-লৌকিকতা ডাক্তার ওষুধ, খরচের শেষ আছে? সবই তো মনোজের ঘাড়ে। বুড়ো ভদ্রলোকটি কী করেন? তাঁর কী ছাই পেনশনের টাকা আছে, তাই দিয়ে দৈনিক বাজারটা আর হপ্তার রেশনটা করে, মনে করেন অনেক করছি। তাও তো সবদিন মাছ-ফাছ দু'বেলা জোটে না। মাঝে মাঝেই রাত্তিরের খাওয়ার পাতে ধোকার ডালনা ছানার ডালনার বাহার দেখিয়ে নিরিমিষ চালান। খেয়াল করেন না, অফিসে কাজ করা লোকেদের রাতের খাওয়াটাই আসল। কে জানে নিজেরা কর্তা গিন্নী বেলা দুটোর সময় ধীরে সুস্থে বসে লাঞ্চটি সারেন কী দিয়ে। কেউ তো দেখতে যাচ্ছে না।

অমিতা বিদূষী, অমিতা ভালো চাকুরীয়া মেয়ে, অমিতার জীবনের পরিধি চারুলতার থেকে অনেক বড়, তবু অমিতার সারাক্ষণের চিন্তাধারা আবর্তিত হতে থাকে, সেই ক্ষুদ্র পরিসরের গণ্ডিটুকুর মধ্যে, যেখানে চারুলতা নামের শীর্ণদেহী কর্মতৎপর প্রৌঢ়াটির জীবন আবর্তিত।

চারুলতা বিদূষী নয়, চারুলতা 'জীবন' বলতে বোঝে আয়ুর খাতে পাওয়া তার এই দিন রাত্রির সমষ্টিটি মাত্র।

সকালটা গড়াতে গড়াতে রাতে পৌঁছয়, রাতটা ঘুমোতে ঘুমোতে, এবং পরবর্তী

দিনের বাজার কুটনো, রান্নাবান্নার ভাবনা ভাবতে, আবার সকালের মুখোমুখি হয়, এছাড়া আর কী ? এরই মধ্যবর্তী অংশটিতে সুখ দুঃখ, সুবিধে অসুবিধে, আশা হতাশার লীলা চলতে থাকে। এই পর্যন্ত! চারুলতার 'জীবন' ভবানীপুরের এই ভাড়াটে দোতলা বাড়িটার রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর খাবার ঘরের মালিকানার মধ্যেই চরিতার্থ।

কিন্তু অমিতা ?

যার হাতের মুঠোয় এই বিশাল পৃথিবীখানা, যার জন্যে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি কর্মজীবন, সেও কেন ওই ছোট্ট ঘর তিনখানার মালিকানার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা দেখে ? আর তার কর্মগত অসুবিধার জন্য সেই ঘর তিনখানায় আধিপত্য বিস্তার করতে পায় না বলে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, 'জীবন' পেলাম না।

যেন ওই হাতে একগাদা লোহা শাখা পরা, কপালে এক গাদা সিঁদুর লেপা গাঁইয়া চেহারার মহিলাটি অমিতার জীবন পাওয়ার উপকরণগুলো কব্জা করে ফেলে ঠকিয়ে চলেছেন অমিতাকে।

অমিতা যখন দেখতে পায় ওই মহিলা পরম পরিতৃপ্তির ছাপ মুখে মেখে, আলু পটল বেগুন কুমড়ো কপি কাঁচকলার সম্ভার ছড়িয়ে বঁটিটি নিয়ে বসে থরে থরে কুটে চলেছেন, তখন ঈর্ষায় বিরক্তিতে অমিতার মাথা জ্বলে ওঠে। ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই পরিতৃপ্তির সাম্রাজ্য !

আশ্চর্য বৈ কি! তবে কি অমিতাও চারুলতার মতই ওই আলু পটল কুমড়ো কাঁচকলাকেই জীবনের উপকরণ ভাবে ? ভাবেই নিশ্চয়, না হলে অমন রোষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কেন একটা চামড়া কুঁচকে আসা রেখাঙ্কিত মুখের পরিতৃপ্তির রেখার দিকে ?

অথচ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল থেকে কেড়ে নিয়ে, সাম্রাজ্যটাকে আয়ত্তে এনে ফেলবার উপায় নেই অমিতার। বড় বন্দিনী অমিতা।

অফিসের ছুটির দিনটিনগুলো আছে বটে, কিন্তু সেখানে আবার আর এক দিকের বন্দীত্ব। শহরের উচ্ছ্বলিত প্রমোদ প্রবাহের উজ্জ্বলিত আকর্ষণের হাতছানি অহরহই প্রলুব্ধ করে চলেছে। তাকিয়ে দেখার সময় নেই। সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিন, সেটাকেও তো উপভোগ করতে ইচ্ছে করে।

বাচ্চাটাকে কিছু আমোদ-প্রমোদের স্বাদ দিতে হয়। অতএব বড় নিরুপায়তা।

কিন্তু এ তো গেল একটা দিক। আর এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের চিন্তা উদ্বেল করে তুলেছে অমিতাকে। ক্রমশঃই দেখতে পাচ্ছে অমিতার সংসারটির মতো অমিতার

ছেলেটাকেও যেন মুঠোয় ভরে ফেলছেন ওই কর্তা গিন্নী। মাকে থোড়াই কেয়ার করে ছেলে। 'দাদু' 'দিদা'ই সব।

গতকালই কি একটা ছুটি ছিল, অমিতা তাতাইয়ের মাছের কাঁটা বেছে দিতে বসছিল, ছেলে একেবারে হাত পা ছুঁড়ে রসাতল। তুমি না। তুমি না। দিদা দেবে। তুমি একদিন কাঁটা বেছে আমার গলায় কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছিলে। দিদা একবার বললেন বটে, 'ও কি রে তাতাই। কবে আবার?' কিন্তু সে তো ফর শো! ভেতরে ভেতরে তো মজা দেখছেন। অমিতার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অমিতার মধ্যে একটা হাহাকার। একটা জ্বলন্ত ক্রোধ!

সংসার পাবে না, ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর অমিতা বুদ্ধুর মতো তাকিয়ে দেখবে, আর নিঃস্ব হয়ে যাবে?

স্বামী?

তাই কি পুরোপুরি পেয়েছে অমিতা?

সেখানেও তো 'মাতৃপিতৃভক্ত' সন্তানের ভূমিকায় বদ্ধ একটা মানুষকে আংশিক পাওয়া মাত্র।

অমিতার এই 'জীবনটা' না পাওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে সে?

মোটেই না। অমিতা বোঝে, অমিতা যখন আপসা আপসি করে, তখন মনোজ বোকা বোকা মুখে বিষণ্ণতার ভান করলেও আসলে ভাবে দুঃখটা অমিতার চিন্তার বিলাস!

এক একদিনের কথায় বেরিয়ে পড়ে বৈ কি। পড়বে না? ভিতরে তো সেই ধারণাটা বদ্ধমূল। তাই অমিতার কথায় বলে ওঠে, রাখো না ওসব হলুদ পাঁচফোড়নের চিন্তা, কেমন মজাটিতে আছি বল তো? প্রত্যেকে আমার লাক দেখে হিংস করে। তোমাতে আমাতে দু'জনে রোজ একসঙ্গে ভাত খেয়ে দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, এক আপিসে কাটাই, আবার একসঙ্গে ফিরি, এবং বাড়ি দেখতে, বাচ্চাটাকে দেখতে কর্মঠ মা বাবা মজুত, এ একেবারে হিংসের জ্বালা ধরিয়ে দেয় ওদের।

মাঝে মাঝে যেন এমনি কথা, গল্পের ছলে ওর কোনো চেনা পরিচিত বন্ধুজনরা একা একা ফ্ল্যাটবাড়ির সংসারের ম্যাও সামলাতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা বিবরণ দিতে বসে। অমিতা যেন এই গল্প করার মানে বুঝতে পারে না। স্রেফ অবোধের ভান করে অমিতাকে বোঝানো—'ভাখো বোঝো একা থাকার কত সুখ। আর বোঝো তুমি কত আরামে আছো।'

আরাম আর সুবিধেটাই সব।

'স্বাধীনতা' বলে একটা শব্দ নেই?

এ যুগে একা সংসার আবার কে না করছে? আবার উপার্জনের চেষ্টায় কোন মেয়েটাকে না বাইরে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে? তাদের বাচ্চারা মানুষ হচ্ছে না? না, তারা খাওয়া দাওয়া করছে না?

তর্কে নামলে—অমিতা বলবে, অনেক ভালভাবেই করছে, অনেক পরিচ্ছন্নভাবেই হচ্ছে।

আধুনিক জীবনের স্বাদ তো কখনো পেলে না বুদ্ধু, তার স্বপ্নও দেখলে না।

অমিতাই এতোখানি বয়েস পর্যন্ত তার ব্যর্থ স্বপ্ন বহন করে চলেছে।

অমিতার বান্ধবীদের বাড়িতে কিচেন কি ছিমছাম। কী নিপুণভাবে সুন্দর খাবার বানিয়ে ভালো টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলে। ঠিক টি ভি-র পর্দায় দেখা বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। ইংরিজি বাংলা পত্র পত্রিকায়, কত দুর্দান্ত রান্নার 'রেসিপি' শিখিয়ে চলেছে। কত শৌখিন সুন্দর সরঞ্জাম ঘর আলো করে বসে আছে, অমিতাই শুধু সেদিকে ভিখিরির মতো তাকিয়ে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে।

আর খেয়ে মরে দু'বেলাই সেই ডাল চচ্চড়ি সুক্ত, ডালনা চাটনি। মাছ মানেই ঝোল ঝাল কি ভাজা! ইলিশের সদগতি একমাত্র সর্ষে ঝালে। অথচ অমিতার বান্ধবী রেখা সেদিন ওকে ভিনিগার দিয়ে রান্না ইলিশের একটা প্রিপারেশান খাওয়ালো, কি দারুণ! সবাইকে আমার বাড়ির ব্যাপার ওদের কাছে বলতে লজ্জা করে। 'মাংস' মানেই মাংসর ঝোল। ওছাড়া যে আর কিছু হতে পারে মাথাতেই আসে না আমার শাশুড়ী ঠাকুরানীর। তাও আর নিজে খান না। অতএব রান্নাঘরে তার প্রবেশ নিষেধ। বাইরের বারান্দায় আলাদা করে। আর মুর্গীর প্রশ্ন তো ওঠেই না। শুনে রেখা গালে হাত দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁরে এখনো এরকম বাড়ি আছে? আর তুই, তার সঙ্গে তাল দিয়ে চলিস? মুর্গী ঢোকে না! এখন তো সকলের কিচেনেই হ্যাম। দে বাবা, তোর একটু পায়ের ধুলো দে, মাথায় ঠেকাই!...তবেই বোঝ, অমিতা বেচারী কোথায় পড়ে আছে।

অথচ মনোজ এগুলো ধর্তব্যই করে না। বলে, হ্যাঁ সব বাড়ি দেখে বেড়াচ্ছে তোমার বন্ধু।

একবার অমিতা জোর করে কিছু আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল। প্রেসার কুকার, (এবাড়িতে এখনো প্রেসার কুকারও 'আধুনিক'।) রাইস কুকার, ওভেন আর একবার একটা প্রাইজ কুপনে পেয়েছিল একটা সুন্দর 'মিক্সচার'। কিন্তু অতঃপর? অতঃপর তারা বাড়ির ভার বাড়িয়ে তাকের ওপর তোলা আছে। সেই মান্ধাতার আমলের হাঁড়ি সরা কড়া চাটু শিলনোড়া নিয়েই কাজ চলছে।

মহিলা বিনা লজ্জায় বললেন, রক্ষে করো বৌমা। আমার দ্বারা ওসব কল-কাঠি

নেড়ে রান্না হবে না বাছা, ও রেখে দাও উঁচু তাকে। গনগনে আগুনে হাঁড়ি কড়া চাপাবো, রান্না হয়ে যাবে। শিলনোড়ায় মশলা ফেলবো, মিটে যাবে। তোমার ওই যন্ত্রপাতির তরিবৎ করায় সময় বেশী লাগে বাবা। পরে তুমি রেঁধো।

পরে! কোন্ পরে? তোমার পরলোক গমনের পরে? তখনো এনার্জি থাকবে অমিতার? অসহ্য।

হ্যাঁ, কয়লার ধোঁয়া করে গনগনে উনুন একটা চাই ওনার। গ্যাসের সিলিণ্ডার আছে বটে, তাতে হয় শুধু চা জলখাবার। সেটা ভাতের সকড়ি হবে না। তাহলে নাকি বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে না!

শুনে রেখা ছন্দা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। যদি বা মনোজ জোর করে বলেছিল, বিকেলে অন্ততঃ কয়লার ধোঁয়া না করে ওতেই রাঁধো। রাত্তিরে তো কেউ ভাত খাচ্ছে না।

তা আমার পূজনীয় শ্বশুরঠাকুর একদিন খেয়েই বললেন, "রাম বলো! ও রুটি আবার মানুষে খায়?" যেন শহরসুদ্ধু মানুষ সবাই 'অমানুষ'!

যাকগে, এসব কথা ফুরোবার নয়। অমিতার একটি আধুনিক জীবনের স্বপ্ন স্বপ্নেই থেকে যাবে। কিন্তু—

হ্যাঁ, ওই একটা কিন্তু অমিতাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে। ছেলেটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। আর তাই বসে বসে দেখতে হচ্ছে অমিতাকে। ছেলে তার দাদুর নকল করে শব্দ করে খাবে, খ্যাক খ্যাক করে কাসবে, 'টেবিলে খাবো না, দাদুর মতন মাটিতে বসে খাবো' বলে বায়না করবে। আর—

দিদার কাছে রান্নাঘরে বসে কুলের আচার খাবে টকাস টকাস করে, এবং যত রাজ্যের সেকেলে সেকেলে পচা পচা গল্প শুনবে। শুধু এই নয়, আবার না কি 'কেষ্টঠাকুরের শতনাম' মুখস্থ করা হয়েছে। দাদু দিদা শুনে মুগ্ধ। দুর্ভাগ্য, ছেলেটার 'বারোটা বেজে' যেতে আর বাকি কি রইল?

পাজীটা আবার এত শয়তান হয়েছে, জানে মা এসব দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তাই মাকে রাগাতে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে 'আজ দুপুরে কোন্ গল্পটা দিদা? ঢেঁকি চিংড়ির?' আর 'বাঁদর রাজাটারও' বলতে হবে কিন্তু। আর হি হি, গোপাল ভাঁড়ের।

ঢেঁকি চিংড়ি! বাঁদর রাজা! গোপাল ভাঁড়! অসহ্য।

একদিন আর না বলে পারে নি অমিতা, বলে ফেলেছিল, 'এসব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গল্প বলার কোনো মানে হয়? তো শুনে ছেলের দিদা যদি বা একটু থমকালেন, দাদু একেবারে হেসে ছাত ফাটালেন। কথার কী যুক্তি, এইসব 'বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি

গল্প শুনে ওর বাপও মানুষ হয়েছে বৌমা। শুধু বাপ কেন, ঠাকুর্দাও। তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে? তোমার সবেতেই আতঙ্ক! চিরজন্ম ছেলেপুলেকে ভূত, ভগবান, জন্তু জানোয়ার পাখিপক্ষীর সঙ্গে পরিচয় করানো হয় এই সব গপ্পো দিয়ে দিয়েই তো? তো তার সঙ্গে একটু মজাটজা না মিশোলে ওরা আকৃষ্ট হবে কেন? আজীবনই দেখেছি ছেলেদেরকে 'একানড়ে' ব্রেম্মদত্যি, শাঁকচুন্নি, মামদো ভূতের ভয় দেখিয়ে বাগে আনার রেওয়াজ! তাতে হতোটা কী? তুমি একেবারে ভয়ে কাঁটা, ওতে ছেলে ভীতু হয়ে যাবে। আর এই যে আজকাল দোকানে দোকানে বাচ্চাদের জন্যে দোহাত্তা এতো ভূতের গল্পের বই দেখি? এতে তো তাহলে দেশসুদ্ধু ছেলেপুলে ভীতু হয়ে যাবে গো মা!

শুনে মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে যায় না? নেহাৎ তখন সিনেমার টিকিট কাটা রয়েছে, টাইমওভার হয়ে যাচ্ছে, তাই জ্বলতে জ্বলতে চলে যেতে হলো। নইলে হয়ে যেতো একটা ফাটাফাটি।

আর এ সবই তাতাইয়ের সামনে। কী চমৎকার শিক্ষা হলো তার? অমিতা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন শয়তানটা কিনা রেলিঙে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, দাদুর কাছে হেরে গেলে! কলা কলা! মনোজকে তো শুনতে হয় না এতো। তখন তো ও সিনেমা 'হল্'-এর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টিকিট হাতে নিয়ে।

মনোজকে এই পরিস্থিতির পরিণাম বোঝাবে, এমন সময় কোথা? রাত্রে? শয়তান ছেলে কখন ঘুমোয়, কখন জেগে থাকে বোঝা শক্ত। এই তো হঠাৎ সেদিন। ঘুমে 'অচেতন' ছেলেটি কিনা হঠাৎ হি হি করে বলে উঠল, 'দিদার নিন্দে করা হচ্ছে? দিদাকে বলে দেব।' ওঃ। এতেও যদি ডাক ছেড়ে চেঁচাতে ইচ্ছে না করে কিসে করবে? কী ভাগ্যি 'মনোজবাবু' সেদিন ছেলেকে শাসন করতে বলে উঠেছিলেন, 'কাল থেকে তোমায় নীচের তলায় সিঁড়ির ঘরে শোওয়ানো হবে, অসভ্য বাঁদর ছেলে। 'নিন্দে' আবার কী! কেউ কারুর কথা গল্প করে না? এই যে আমি ঘর অগোছালো করি, দাড়ি কামিয়ে জিনিস ফেলে রাখি, এসব কথা বলে না তোমার মা? সেটা নিন্দে হয়ে গেল? ঠিক আছে। ওই সিঁড়ির ঘরে আরশোলাদের সঙ্গে শুয়ো।

বাপের ওই শাসনে ছেলের একটু কাজ হয়েছিল। বলে ওঠা হয়েছিল, ঠিক আছে। কাল থেকে আমি কানে আঙুল দিয়ে ঘুমোবো।

কিন্তু বিষবৃক্ষের কী একটাই ডাল? না সব ডালগুলোই একরঙা? আজ অমিতা একটা কিছু করেই ছাড়বে।

প্রার্থিত বাসটি আসতে দেরী করছে।

মনোজ অমিতার লাল লাল মুখের দিকে তাকাল। 'ছেলেটাই যে তাদের ডোবাবে' এ অভিযোগ অমিতার মুখে নতুন শুনল না, তবে মুখটা অমিতার যেন আজ বড্ড বেশী লাল। আস্তে বলল, আবার কী হলো?

হচ্ছে প্রতিনিয়তই, তুমি তার কতটুকুর খবর রাখো? আজ আমায় কী বলেছে জানো? 'টিফিনে দিদার তেঁতুল আচার একটু নিয়ে গেলেই যতো দোষ? আর নিজেরা যখন রাস্তায় বেরোলেই ময়লা ভাঁড়ের তেঁতুলজল দেওয়া ফুচ্‌কা খাওয়াও; তখন দোষ হয় না? দিদারা যেন তোমার শত্তুর। না?'

চোখে সর্ষেফুল দেখাটা এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তবু মনোজ সেটা দেখল এখন থতমত খেয়ে বলল, এই কথা বলেছে?

তো কি আমি বানিয়ে বলছি?

না, মানে ব্যাপারটা তো দেখছি ক্রমশ ডেঞ্জারাস হয়ে উঠছে।

যাক্ তবু একটু বুঝলে। কানও দাও না, চোখও দাও না, তলে তলে আমাদের ভবিষ্যতের কী সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ভেবে দেখো।...আবার গ্যাখো না তুমি ছেলে-বেলায় কত দুষ্টু ছিলে কত অবাধ্য ছিলে কীরকম লুঠপাট করে তোমার ঠাকুমার ভাঁড়ার থেকে আমসত্ব কুল তেঁতুলের আচার খেয়ে নিতে গাদা গাদা, দুধ খাওয়ানোর জন্যে ঢোকে ঢোকে গল্প বলতে হতো তোমায়, এইসব যত গল্প ইতিহাস নাতির কাছে বলা চাই। এগুলো বলার কোনো দরকার আছে? ছেলের দুঃসাহস বাড়ানো ছাড়া? এতে তোমার ওপর ভয় সমীহ থাকবে তাতাইয়ের?

উত্তেজিত এই প্রশ্নের মধ্যেই বাসটা এসে গেল। সেখানে আর ওই উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন নেই। দুজনেরই হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলন্ত অবস্থা। তবে ঝুলন্ত দুলন্ত যে কোনো অবস্থাতেও মন তার নিজের কাজ করে চলতে পারে। কাজেই উত্তরটা মনোজ মনে মনেই দিতে থাকে, দিয়ে চলে।

এতো বেশী উত্তেজিত হবার মত কী এমন ঘটনা ঘটেছে হে মহিলা? তুমি তো দেখছি সর্বদাই দড়িকে 'সাপ' ভেবে আঁৎকাচ্ছো। বলি আমার ছেলেবেলায়, আমার ঠাকুমা আমার বাবার শৈশবকালকে আমার কাছে বিবৃত করতেন না রসিয়ে রসিয়ে? আমার যত দুষ্টুমীর আর বেয়াড়াপনার গল্প বলতেন না? তাতে আমার ইহকাল পরকাল সব ধ্বংস হয়ে গেছে? বাবার ওপর আমার ভয় সমীহ ভক্তি ভালবাসা জন্মায় নি? মা বাপের ওপর আমার ভক্তি ভালবাসা নিয়ে টিপ্পুনি করতে ছাড়ো?

মনের মতো স্বাধীন আর কে আছে ? কে আছে চিন্তার মত 'অবাধ গতি' ? ভাগ্যিস আধুনিক 'বিজ্ঞান শক্তি' এমন একখানা 'এক্স-রে আই' বানিয়ে বসে নি এখনো, যেটা চশমার সঙ্গে সেঁটে নিয়ে পরে বসে থাকলেই অপর জনের এই চিন্তা-ধারার ধরন, ধরে ফেলতে পারবে ? বিজ্ঞান যদি পৃথিবীর তেমন দুরবস্থা এনে দেয় কোনোদিন, সেটাই হয়তো পৃথিবীর শেষ দিন হবে।

যাক, এখনো আসেনি তেমন দুরবস্থা। তাই মনোজ ভেবে চলতে পারে, ছেলের দোষ দেওয়া হচ্ছে। আর দোষ দেওয়া হচ্ছে গুরুজন দুজনকে। হে আধুনিকা, উঠতে বসতে খেতে শুতে তুমি সারাক্ষণ করো না ওনাদের দুজনের সমালোচনা ? তীব্র কটু কষায় ঝাঁজালো ঝাল। সেই সব সমালোচনার ভার ওই অবোধ শিশুটার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে, ভেবেছ কোনোদিন সে সব ?
ছেলের কুশিক্ষা হবে, 'রাজা বাঁদরের' না কি আর 'গোপাল ভাঁড়ের' গল্প শুনলেই ? গোপাল ভাঁড়ের গল্প না শুনে আবার কোন্ বাঙালীর ছেলেটাই বা মানুষ হয়েছে ? আমি শুনিনি ? অসভ্য গাঁইয়া হয়ে গেছি ? আমার ঠাকুমাও তো আমায় 'জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর' শিখিয়েছিলেন, তাতে বারোটা বেজে গেছল আমার ? খোল কর্তাল নিয়ে হরিনাম করে নেচে বেড়াচ্ছি ? কুশিক্ষা ! ছেলের কানের কাছে গুরুজনদের সম্পর্কে সর্বদা সমালোচনা কুশিক্ষা নয় ? বাপের ওপর ছেলের 'সমীহ' আসবে না ! হায় অদৃষ্ট ! তুমি তো ছেলের সামনে আমাকে রাতদিন কচুকাটা করছ, তাতে কোনো রি-অ্যাকশান হচ্ছে না ?···আমি আমার জীবনের একটি পরিচিত ছাঁচের মধ্যে বর্ধিত হয়েছি, সেই ছাঁচের মধ্যে সুবিধে অসুবিধে দু রকমই আছে তবু তার সম্পর্কে আমার গভীর একটা মূল্যবোধও তো আছে। আমার মা বাপ পরিচিত পরিজন সকলের মধ্যে থেকেছি, সব কিছু মানিয়ে নেওয়া জানি। সেখানেই এই মনোজ রায়ের সত্তার অস্তিত্ব। সেখানেই মনোজ রায়ের জীবনের শিকড়। সেই জীবনের মধ্যে তুমি এসে দাঁড়ালে। এসেই তুমি আমার সেই সত্তার অস্তিত্বকে ঘৃণা আর ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখলে, আর তৎক্ষণাৎ থেকেই শুরু করলে আমাকে শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে গিয়ে তোমার বাসনার মাটিতে পুঁততে। কিন্তু—সেই মাটিটি আমাকেই সংগ্রহ করে দিতে হবে। আশ্চর্য এই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা। তুমি একখানি অনাস্বাদিত আধুনিক জীবনের স্বপ্ন দেখছ, সেই স্বপ্ন সফল হওয়াবার জন্যে তুমি উত্তাল হচ্ছো, অস্থির হচ্ছো, দাম্পত্যজীবনের সমস্ত মনোরম মুহূর্তগুলিকে ক্লেদাক্ত করে তুলছ। তোমার এই প্রলয়ঙ্করী মূর্তির কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আমার আর গতি নেই। কারণ আমি একটু শান্তির কাঙাল। আমি সেই শান্তিটুকু কিনতে

যুধিষ্ঠিরের পাশার পণের মতো 'সর্বস্ব' পণ ধরে বসেছি।

আমার ন্যায় নীতি, বিচার বিবেচনা বোধ, সভ্যতা ভব্যতা, চক্ষুলজ্জা সব কিছুই তো ওই সর্বস্বের ঘরে জমা আছে? কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি, তোমার তীব্র বাসনার ক্ষুধার আকর্ষণে সে সমস্তই খোয়াতে হবে। হবেই। চোখের সামনে আকাশের গায়ে সেই লেখা ফুটে উঠতে দেখছি। 'ওরে মূঢ় শান্তিপ্রিয়, তোর নিস্তার নেই! তোর বধকার্য আসন্ন। হাড়িকাঠ তৈরী হচ্ছে।'

আশ্চর্য! কেন আমি ওই অধৈর্য অসহিষ্ণু জেদি আত্মকেন্দ্রিক হৃদয়হীন রমণীটিকে এত ভয় করি? কেন কিছুতেই তার অন্যায় কথাগুলোর প্রতিবাদ করে উঠতে পারি না? ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আত্মার বিরুদ্ধে নিরুপায় সমর্থন করে চলি? নিশ্চিতই তো জানছি ও আমার একান্ত নিজস্ব সুখের আর নিশ্চিন্ততার জীবনটি থেকে উৎপাটিত করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে আছড়ে ফেলতে চায়। তবু আমি সেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারি না।

আমার যেখানে যত আত্মীয় আছে, তাদের সব্বাইকে তুমি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে, তারা বেড়াতে এলে বেজার মুখে ঘুরে বেড়াবে, আর তারা কথা কইতে এলে এমন 'শীতল' উত্তর দেবে যে, আর দ্বিতীয়বার তারা তোমার দিক ঘেঁষতে আসবে না। কারণ তারা তোমার ওই অতি আধুনিক বান্ধবীদের মতো কৃত্রিম নয়। তারা মেকি পালিশের জোরে তোমার কাছ থেকে মুগ্ধ পূজা পাচ্ছে। আশ্চর্য!

আমার তো ওদের দেখলেই হাড় জ্বলে যায়। ওই যে ভঙ্গী, যা কিছু বাঙালীয়ানা, তাই দেখেই অবাক হওয়া, আকাশ থেকে পড়া, যেন জীবনে এসব দেখে নি শোনে নি। উঃ। তোমার এক বান্ধবী যেদিন চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে বলেছিল, 'কচু' জিনিসটা সত্যিই খাওয়া যায়? খায় কেউ? য্যাঃ! কচু ঘেঁচু তো একটা ঠাট্টার কথা!

তিনি নাকি জন্মে কখনো জানেন না—কচু জিনিসটা কেমন দেখতে!

এই অসার ভেজাল মালগুলিই তোমার আদর্শ। তোমার উপাস্য দেবী।

অথচ নিজেকে তুমি খুব বুদ্ধিওলা ভাবো।

চিন্তা অবশ্যই বাতাসের থেকেও অগ্রগামী তাই ভবানীপুর থেকে ড্যাল্‌হাউসি আসার পথটুকুতে মনোজ রায় নামের লোকটা এতো অজস্র কথা ভেবে চলেছে। না কি বলে চলেছে?

তা বলেই চলেছে নিঃশব্দ উচ্চারণে—আমার শৈশবে কী দেখেছি আমি, ঠাকুমা সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ঠাকুমার ভয়ে আমার মা কাঁটা। আর এখন কী দেখছি?

এ সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা 'তুমিই। মা তোমার ভয়ে কাঁটা। যার সাহস নেই তোমার ওপর একটা কথা বলবার। মার পোষ্ট মাত্র সংসারে সেবিকার! আমার বাবা! হয়তো বাবা মার মত অতটা বুদ্ধি ধরেন না বলেই, মাঝে মাঝে কিছু বলে ফেলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ্যুমির শাস্তিও পান। আমি সে শাস্তির নীরব দর্শক। সরব হবার উপায় বা কী? তাতে ওনার লাঞ্ছনা বাড়বে বৈ কমবে কী? নিরুপায়তাটা তো এইখানেই। তোমরা 'আধুনিক'। অতএব নির্লজ্জ হতে বাধে না তোমাদের।

কী তুচ্ছতার মধ্যেই তোমার মন আবর্তিত অমিতা। ভাবলে মাথা কাটা যায় আমার। ভেবে দেখো সেদিনের কথা? ধোবার হিসেবটা তুমি লেখো। সেই জন্যে তাকে নির্দেশ দেওয়া আছে রবিবারে আসার জন্যে এবং ধোবাটাকে তুমি 'বাড়ির ধোবা' মাত্র না ভেবে, নিজের বলে মনে করো।...তা করো বেশ করো, কিন্তু লোকটা সেদিন বাবার একটা ধুতি হারিয়ে দিয়েছিল, এই কথাটি বলা মাত্র তুমি সাপিনীর মতো ফোঁস করে উঠলে? তুমি জোর দিয়ে বললে, না আপনার ধুতি যায় নি। আর তা হলে লেখা বোধহয় লেখা হয় নি এই সন্দেহ প্রকাশ করায়। তোমার অহমিকায় এমন আঘাত লাগল যে, তুমি তার পরের সপ্তাহে আমার মা বাবার ময়লা জামা কাপড় আলাদা করে সরিয়ে রাখলে! তুমি অনায়াসে বাবাকে বলে গেলে, 'ওগুলো আপনিই লিখবেন।'

কত অবলীলায় মানুষকে অপমান করতে পারো তুমি অমিতা, সেদিন আর একবার নতুন করে দেখলাম। মূক বধির অন্ধের ভূমিকায় সে দৃশ্য দেখে যাই আমি।...

অথচ অমিতা তোমার নিজের বেলায় মনের কানা কা টনটনে। বাতাসের ভর সয় না। এ বাড়িতে কেউ ভাবতে পারে না, তোমার কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ করবে, কিম্বা তোমার কোনো কাজের ভুল ধরবে। অথচ তুমি? অমিতা, তুমি প্রতিটা মানুষের প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রতিবাদ করবে, তীব্র মন্তব্য করবে, আর প্রতিটি কাজের ভুল ধরবে। তোমাকে যে কোনো পরামর্শ দেওয়া যায়, এ প্রশ্ন নেই অমিতা! তুমি জানো তোমার কথাই শেষ কথা। আমি তোমার সেই তালে তাল দিয়ে চলেছি। আধুনিকতার এই অভিশাপ অমিতা, এখানে অ্যাড্‌জাস্টমেণ্টের কোন প্রশ্ন নেই। হয় এস্পার নয় ওস্পার। কিন্তু অমিতা, তুমি যদি আমার চিরকালের অভ্যস্ত জীবনের ছাঁচটার সঙ্গে একটু অ্যাড্‌জাস্টমেণ্টের চেষ্টা করতে! না, সে চেষ্টার ইচ্ছেই হয় নি তোমার কোনোদিন। তুমি অবিরত মনে মনে হাতুড়ি কুড়ুল শাবল গাঁইতি দিয়ে সেই ছাঁচটাকে ভেঙ্গে চলেছ। এখন মনে মনে ক্রমশঃ হাতেই চলে আসবে ওই হাতুড়ি শাবল গাঁইতি। আর তারপর আমার সারা জীবনের অভ্যাস বিশ্বাস ধারণা

মূল্যবোধ, আমার সেন্টিমেন্ট, আমার চিরদিনের আত্মীয় সমাজ সব কিছুকে নস্যাৎ করে তুমি আমাকে দিয়েই তোমার বাসনা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের কল্পনা আশ্রিত ছাঁচটি বানিয়ে নিয়ে আমায় তার মধ্যে ভরে ফেলবে। যেমন চিড়িয়াখানার মালিক তাদের মজবুত খাঁচার মধ্যে তার ধরে আনা জন্তু জানোয়ারদের পুরে ফেলে।

তা এই 'আধুনিকতা' নামের বিকৃতির ছাঁচের চিড়িয়াখানায় এমন অনেক শিকারই পোষ মেনে বসে আছে। অতএব আমার কেস্‌টা নতুন কিছু ব্যতিক্রম হবে না। ক্রমশঃই আমরা এই 'আধুনিক' নামধারী পুরুষরা তোমাদের আর মনে করিয়ে দেবার সাহস অর্জন করতে পারছি না, 'মানুষ ইঁট কাঠ নয়'। প্রতিবাদ করে উঠে বলতে পারছি না। 'কেন আমরা আমাদের অতীতকে মুছে ফেলে, তোমাদের ছাঁচের মধ্যে ঢুকে পড়ব ?'

কিন্তু কেন পারছি না ?

সেইটাই তো রহস্য। অথচ তিলে তিলে অনুভব করছি, ক্রমশঃই আমি আমার সত্তা হারিয়ে ফেলতে ফেলতে তোমার সেই ভবিষ্যৎ ছাঁচের অনুকূল মূর্তিতে গড়ে উঠছি।

আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এই দ্রুত পরিবর্তিত রূপের দিকে বড় বেদনা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আমার মা, আমার বাবা।

তাঁরা তো এমন অসম সাহসিক ভাবনা ভাবতে পারবেন না। তোমার ওই সরল প্রবল অধিকারের মুষ্টি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের ছেলেটাকে, তাদের একমাত্র সন্তানটিকে আবার তার নিজস্ব চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে জমিটা তাঁরা বিকিয়ে দিয়েছেন, সে জমিতে তার নতুন মালিক ধানই বুনুক আর পাটই বুনুক বলার কিছু থাকে না। বলতে যাওয়া মানেই ধৃষ্টতা।

কিন্তু অমিতা, এত প্রবল হবার কি সত্যিই কোনো দরকার ছিল তোমার ? তোমার প্রতিপক্ষ তো নেহাৎই ভুটো 'কাটা সৈনিক'।

ক্রমশঃ বুঝতে পারছি, ওই কাটা সৈনিক ভুটোর মাটি দখল করে এক পাশে পড়ে থাকাও অসহ্য তোমার। অথচ সেই মাটি থেকে অন্য কোথাও ফেলে দেবারও উপায় নেই। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান।

কিন্তু আমিই বা কী ? অ্যাঁ ! আমিই বা কী ? আমি তো একবারের জন্যেও বলে উঠতে পারি না, অমিতা এ মাটিটা একদিন ওঁদেরই ছিল। তোমার চোখে এই সংসারটা যতই মূল্যহীন হোক, এটা ওঁদেরই বড় ভালবাসা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা।

আর ওহে নাক উঁচু মহিলা, তিল তিল করে আরো যে জিনিসটিকে তারা গড়ে তুলেছিল এবং তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেব, যাঁকে তুমি এই কাটা সৈনিকদের থেকে অনেক উঁচুদরের মানুষ বলে মনে কর, সেই তিনি নিতান্ত বিনীত হয়ে এসে তার হাতে তোমায় তুলে দিয়েছিলেন অথবা বলতে পারো তার গলায় তোমায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন অবশ্য তুমি প্রতিপদে সেই 'গড়ে তোলার' বস্তুটির অজস্র খুঁৎ বার করে চলেছ। তবু অস্বীকার তো করতে পারো না, এই কাটা সৈনিকরা তোমার বাবার দরজায় প্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়ান নি। প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন তোমার বাবাই?

কিন্তু তোমাকে কোনো কথা 'মনে পড়িয়ে' দেবার সাধ্য কার আছে? কে বলে উঠতে পারবে, ওহে নাক উঁচু মহিলা, এতো অহঙ্কারটি কেন তোমার? কেন তোমার নিজের সম্পর্কে এতো ওভার এস্টিমেট? তুমি কী তখন কোহিনুর হীরে?

বলে ওঠার কথা তো আমারই। আমার সভ্য শান্তিপ্রিয় মা বাপ, এমন কথা বলে ওঠার কথা ভাবতেও পারেন নি, তাই-না দিনে দিনে ওই কাটা সৈনিকেরই ভূমিকায় গিয়ে পৌঁছেছেন। আমি একটা বুদ্ধু, গাড়োল, আমি পয়লা রাত্তিরে বেড়াল কাটার থিয়োরিটা খেয়াল করি নি।

করি নি। এখন আর কিছু করার নেই। আগুনকে বাড়তে দিলে, সে যখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তখন আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু গাড়োল আমি আগুনকে ফুলঝুরির ফুল ভেবে গুরুত্ব দিই নি। প্রথম সেই দিনটাই কথাই ভাবো অমিতা। তুমি তখন সবে এসেছ এ বাড়িতে একদম নতুন।

আমার বরাবরের অভ্যাস মতো মা আমার ভাত বেড়ে ধরে দিয়ে পাতে আমার নির্দিষ্ট নিয়মের মাখনের ড্যালাটি দিয়ে অভ্যাস মতো একটু গরম ভাত চাপা দিয়ে যাচ্ছেন, তুমি ও কী! ও কী! বলে এমন ভাবে শিউরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলে, যেন তোমার প্রিয়তম স্বামীর পাতে একটা কোলাব্যাঙ্ লাফিয়ে পড়েছে।

মা ছেলে দু'জনেই হতভম্ব। কী হল। তুমি বলে উঠলে, অতখানি কাঁচা মাখন দিচ্ছেন?

মা তো জানেন না, ছিপছিপে গড়ন তিরতিরে মুখ তাঁর ওই সুন্দরী বধূমাতাটি কী বস্তু। তাই—হাস্যবদনে বললেন, এ খোকার বরাবরের অব্যেস। ভাতে পাতে বড় একটি ড্যালা মাখন চাইই চাই। ছোট্টবেলা থেকে।

কিন্তু বধূমাতা কি এই অমোঘ যুক্তিতে কর্ণপাত করলেন? পাগল! সে মাল মশলায় তৈরী নন তিনি। তাই বলে উঠলেন, 'চাইই চাই।' চমৎকার! লিভারের বারোটা বেজে যেতে ক'দিন লাগবে? বলে ওই ব্যাঙ্ পড়ার মতই মাখন সমেত খানিকটা

ভাত তাঁর স্বামী দেবতার পাত থেকে তুলে নিয়ে পাশে একটা বাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, দোহাই আপনার এ রকম আর দেবেন না।

আমার তখন কী করা উচিত ছিল?

অ্যাঁ! শালা বুদ্ধু মনোজ, কী করা উচিত ছিল? তোর এই অনেকের হিংসে উদ্রেককারী, দীর্ঘ সুঠাম মজবুত শরীরটার দিকে বৌয়ের চোখ ফেলিয়ে, বলে ওঠা উচিত ছিল নাকি, বাল্যকাল থেকে তো চালিয়ে যাচ্ছি। লিভারের বারোটা বেজে গেছে মনে হচ্ছে?

না, তা তুই বলতে পারলি না শালা। পয়লা রাত্তিরটায় তরোয়াল খুঁজে পেলি না। তোর অপ্রতিভ অপদস্থ মার মুখের দিকেও তাকাতে পারলি না। বরং কিনা বিজ-বিজ করে বলে বসলি, অবশ্য কাঁচা মাখন খুব খানিকটা খাওয়া উচিত নয়, ঠিকই। এই একটা ব্যাড হ্যাবিট্ হয়ে গেছে আর কী!

তবে? তবে আর এখন তুই অন্যকে দোষ দিচ্ছিস কেন শালা?

এই স্বর্ণ সুযোগের দরজা খোলা পেয়ে গেলে, তোর জন্ম জন্মান্তরের গার্জেন, তোর যাবতীয় ব্যাড্ হ্যাবিট উচ্ছেদ করার কাজে লেগে যাবে না? আর উঠতে বসতে চারুওষ্ঠ বঙ্কিম করে ব্যঙ্গ হাসি হাসবে না তোর এ যাবতের জীবনের যত কিছু বোকামী গাঁইয়ামী আর কুসংস্কার দেখে দেখে?

তুই শালাও তো তাতে মরমে মরে গিয়ে সকল প্রকার ব্যাড-হ্যাবিট্ ত্যাগ করতে শুরু করলি।

তোর মিষ্টি খাওয়ার একটা ব্যাড্ হ্যাবিট ছিল, যার জন্যে তোর মার প্রতিদিনের কাজ ছিল, ছেলের জন্যে নানারকম মিষ্টান্ন তৈরী করা, সেটা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। তুই বলতে শুরু করলি, মিষ্টি জিনিসটা হচ্ছে শরীরের পরম শত্রু। তোর ছিল যত কিছু তরকারির প্রতি আকর্ষণ, অবশ্য তোর বাবারও, তাই তোর মার রান্নাঘরে ছিল রোজই সমারোহ। একজন এনে সাপ্লাই করছেন, আর অপরজন কুটে বেটে রান্না করে পরিবেশন করছেন। নিত্য দিনের খাওয়াটাই ছিল যেন দৈনিক একটা আহ্লাদের অধ্যায়।

পুত্র থালার সামনে বসে বলে উঠেছে, আজ তোমার কী কী অবদান মা?

বাবা বিগলিত হাস্যে বলেছেন, তাকিয়ে দেখ। এই সাত সকালে একাহাতে মোচার ঘণ্ট, নারকেল কুমড়ি, আলুপোস্ত, মুড়ো দিয়ে ডাল! খা বাবা ধীরে সুস্থে, এখনো অফিসের দেরী আছে।

একসঙ্গে পুত্রস্নেহ আর পত্নীপ্রেম, দুইয়েরই মধুর মোহন অভিব্যক্তিটি ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। অতএব—পরদিন আবার নবীন উৎসাহে লাউ চিংড়ি, পুঁই ছ্যাচড়া

আর পালং ঘণ্টর জোগাড়ে লেগেছেন।

হায়! সেই আহ্লাদের হাট আর ক'দ্দিন বজায় থাকল, সংসারে আধুনিকতার হাওয়া প্রবেশ করার পর?

অমিতা, তুমি আমাদের খাওয়ার পাতে জঙ্গলের সমারোহ দেখে মুহূর্মুহু মূর্চ্ছা যেতে শুরু করলে আর জঙ্গল অপসারণের কাজে লেগে পড়লে। কিন্তু বুদ্ধিমতী তুমি, নিজে রইলে অন্তরালে আপাত নিষ্ক্রিয়। এই তিনটা পালা তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির আশায় এবং তোমার কাছে হেয় হবার লজ্জায়, তোমার হাতিয়ারের ভূমিকাটি স্বেচ্ছায় তুলে নিল নিজের হাতে। অতঃপর?

অতঃপর আমার ওই 'জঙ্গলগুলো' আর পেটে সহ্য না হতে থাকায়, রান্নাঘর দ্রুত জঙ্গলমুক্ত হয়ে গেল।

লজ্জায় ঘেন্নায়, আমার বাবা তাঁর একান্ত প্রিয় বাজার করার অভ্যাসটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলে, নিজেও জঙ্গলে আসক্তি ত্যাগ করলেন।

অনুন্নত সংসারটা উন্নত হলো। কিন্তু অমিতা, তোমায় আর কী জিজ্ঞেস করব, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করি মাঝে মাঝে, আচ্ছা আমরা যখন অনুন্নত ছিলাম, তখন কি খুব দুঃখী ছিলাম? আর এখন উন্নত হয়ে খুব সুখী?

'লিভারের বারোটা বেজে যাবার' 'আশঙ্কার কালে, কখনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি বলে তো মনে পড়ে না, কদাচ কখনো কিছু এদিক ওদিক হলে, ঠাকুমার কাছে শেখা, মার দু-চারটে টোটকা জাতীয় ব্যাপারই যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু এখন? এখন মাসে মাসে প্রেসার চেক্ করা কম্পালসারি হয়ে গেছে। অবশ্য তোমার সুচারু ব্যবস্থাপনায় আর নির্দেশনায় এটি একটি সুশৃঙ্খলে চলছে।

আমার আর একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল প্রতিদিন সকালে একবার মার ঠাকুরঘরে (ঠাকুমার আমলেরই ঠাকুর অবশ্য) গিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে আসা। আর পথে বেরোবার আগে, দালানের দেয়ালের টাঙানো কালী ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে একটু নমস্কারের মতো করা। এখন আমি সে সব থেকে মুক্ত। কারণ তোমার ঈষৎ বঙ্কিম ওষ্ঠের হাসিটা আমায় যেন অধোবদন করে দিয়েছে। এইভাবেই রূপান্তর।

এখন আমি পুরোপুরি একটি পালিত পশুর খোলসে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু মালিকের মনটা কি পেয়েছি সত্যি? তোমার অনেক অ্যাম্বিশান। তুমি চট করে থামতে রাজী হবে কেন? তুমি আমায় অবিরত অঙ্কুশ মেরে চলেছ তোমাকে সেই অ্যাম্বিশানের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা কি কোনো খানে সীমায় ঠেকবে?

আমার কোনো 'লক্ষ্য' নেই দেখে তুমি অবাক হও, মর্মাহত হও, 'উচ্চ আশাহীন'

পুরুষ মানুষকে তুমি অবজ্ঞা করে কুলিয়ে উঠতে পারো না।

কিন্তু আমি অথবা আজকের আমরা কি সত্যিই একটা 'পুরুষমানুষ' ?

'সুখী পরিবার গড়তে যাওয়া' এই ছাঁচের পুতুল আমরা, পুরুষও নই মানুষও নই, একটা 'জীব' মাত্র ?

তবে ? জীবমাত্রর আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কী ? একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তোমার তুষ্টিসাধন। জানি এখন তুমি যে 'বাড়ির' নেশায় মেতেছ, সে নেশাটা মিটলে, গাড়ির নেশায় মাতবে, সেটা মিটলে সর্বতোভাবে আধুনিক হবার নেশায় মাতবে, ছেলেকে যথার্থ কৃতী করে তোলায় মাতবে আর তারপর বহুবিধ ব্যাধি আর বাতিকের শিকার হয়ে ডাক্তার আর চিকিৎসার নেশায় মাতবে।

এর সবই জানি। শুধু তোমাকে জানানো যায় কি করে সেটাই জানি না।

চিন্তা বাতাসের গতি, অফিসমুখী যানবাহনের জ্যামজটে আটকানো গাড়ির গতি কচ্ছপতুল্য। তবু একসময় দুটোই একটা দরজায় এসে থামে।

দুজনেই সেই দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ে। মনোজ আর অমিতা। অনেকের ঈর্ষা আকর্ষণকারী একটি 'লাকী' দম্পতি!

দু'জনে এক দরজা দিয়ে ঢুকলেও, দুজনের চেয়ার তো আর পাশাপাশি নয়। ফের দেখা সেই টিফিনের সময়। আগে মনোজ বাড়ি থেকে টিফিন আনতো। অতএব অমিতাও কিছুদিন। কিন্তু নিত্যদিন লুচি আলু চচ্চড়িতেও তো লিভারের বারোটা বেজে যাওয়া অবধারিত। কাজেই অমিতা তার শাশুড়ীর আরও একটা কাজ কমিয়ে দিয়েছে। এখন তারা অফিসক্যান্টিনে টিফিন করে।

মনোজের ইচ্ছে ছিল না যে অমিতার সেই তখনকার আক্ষেপের ব্যাপারটা আবার খুঁটিয়ে তোলে, কিন্তু মনোজের তো একটা ভবিষ্যৎ চিন্তাও আছে, এখন যদি সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না করে, ভুলে যাওয়ার ভান করে, পরের জন্য সেই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণগুলি তোলা থাকবে না ? ছেলের শিক্ষাদীক্ষা চরিত্রগঠন, ভবিষ্যৎ এ বিষয়ে মনোজের কোনো চিন্তামাত্র নেই বলে।

অতএব মনোজকে বলতেই হয়, হ্যাঁ, তখন হ্যাঁ, তখন কী বলছিলে তাতাইয়ের ব্যাপারে ?

অমিতা, একটা মশলা ধোসায় কামড় দিতে দিতে বলে, বলবার কিছুই নেই। তাতাইয়ের যা সর্বনাশ হবার, তা হয়ে গেছে।

অনেক আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমাদের।

কী করেছে তাতাই ?

আমাদের ডোবাবার জন্যে যা কিছু করবার তা' করেছে। অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু এখন নতুন কী হলো ?

কী হল ? আমাদের ফ্ল্যাট কেনার কথা চাউর হয়ে গেল।

ফ্ল্যাট কেনা ! চাউর হওয়া।

মনোজ আড়ষ্ট মুখে বলল, এখনো তো কোথায় কী। পজিশন পেতে তো—

'সেই তো। কোথায় কী !' অথচ তোমার পুত্র রত্ন সেটি ঘোষণা করে বসেছেন। আর শুধু কি তাই ? অমিতা এখন ধোসার বদলে ঠোঁটে কামড় বসায়।

শয়তান ছেলেটা তোমার মা বাবাকে কী বলেছে জানো ? বলেছে, আমাদের নতুন বাড়িতে তোমাদের নিয়ে যাব না, কলা কলা। শুধু আমরা যাব।

অ্যাঁ !

মনোজ সেকালের ভাষায় 'পাংশুমুখে' বলে, ওঁদের সঙ্গে এরকম—ওঁদের তো ভালইবাসে ! হ্যাঁ, ঠাকুমা ঠাকুর্দাকে যে মনোজের ছেলে খুব ভালইবাসে সেটা তো মনোজের অজানা নয়। এবং সেই 'ভালবাসাটা' নিয়েই যে সংঘাত, তাও অজানা নয়।

আসল জ্বালা তো অমিতার ওখানেই। কোনোমতেই 'নদীমুখ' এদিকে ঘুরিয়ে ফেলতে পারছে না। অমিতার ছেলে অমিতার বিরোধীপক্ষের বশ হয়ে, তাদের কাছেই পড়ে থাকতে চাইবে, তাদের ভালবাসবে, এ জ্বালার তুলনা কোথায় ?

কই তাতাই তো তার মামার বাড়ির দিদাকে এতো ভজে না ? এই অমার্জিত চেহারা, গ্রাম্য মনোভাবযুক্ত, অশিক্ষিত ধরনের মানুষ, এরাই তাতাইয়ের প্রাণের আরাম।

এটাই তো জানা। হঠাৎ উল্টো সুর কেন ?

কেন ?

অমিতা চাপা রাগের গলায় বলে, কেন আবার ? শয়তানী। মা বাপকে অপছন্দ করার ফন্দী ! শুধু কি ওই ? আরো কী বলেছে জানো ? বলেছে, কেন নিয়ে যাব ? তোমরা নোংরা বিচ্ছিরী বোকা গাঁইয়া। তোমরা আমায় 'কুশিক্ষা' দিয়ে দিয়ে বুদ্ধি খারাপ করে দিচ্ছ, লুকিয়ে আজে বাজে জিনিস খাইয়ে খাইয়ে আমার লিভার খারাপ করিয়ে দিচ্ছ, তোমাদের জ্বালায় আমার 'মাম্মী' একদিনের জন্যে সুখ পায়নি, তোমাদের জ্বালায়—

হাতের পেয়ালা হাতে রেখে পাথর হয়ে যাচ্ছিল মনোজ, হঠাৎ ছিটকে উঠল, কী বলছ কী ? এই সব বলেছে ?

বলেছেই তো। আবার বলেছে, অত সুন্দর নতুন ফ্ল্যাটে তোমরা কী করে থাকবে

শুনি ? তোমরা তো নোংরা। দাদু ময়লা ময়লা লুঙ্গী গেঞ্জি পরে বেড়াবে, দিদা শুচিবাই না কী যেন করবে, আর একগাদা ঠাকুর, আর গঙ্গাজল গোবর না কি, নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে। তোমাদের আবার নিয়ে যাচ্ছি! হাতী! তোমরা এই পচা বাড়িতে পড়ে থেকে হু হু করে কাঁদবে!

অমিতা!

মনোজ কপাল টিপে ধরে বলে, এসব কী বলছ তুমি, বুঝতে পারছি না। ও কী হঠাৎ পাগল-টাগল হয়ে গেল ?

হ্যাঁ! পাগল হয়ে গেল! আমাদেরই পাগল করে ছাড়বে তোমার ওই ছেলে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই ছেলে মনোজের।

অমিতা রুমালে হাত মুছে মসলা কুচি মুখে ফেলে বলে, বিষের চারা চারাতেই ওপড়াতে হয়। গোড়া থেকেই বলছি, কুশিক্ষার চাষ চলছে। স্কুলটা কাছে পড়ে, এই ছুতোয় ওকে আমাদের ওখানে গড়িয়াহাটের বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলাম, তুমি বললে, ছেড়ে থাকতে পারব না। দেখছ তো তার পরিণাম ? আসলে তুমি তোমার মা বাবা থাকতে পারবেন না ভেবেই, ওই কৌশল করেছিলে, আমি কি আর বুঝিনি ?

মনোজ কি এখন বিরক্ত হয়ে চড়ে উঠবে ? বলবে, উল্টোপাল্টা কথা বলছ কেন ? তাতাই তো ওঁদের বিরুদ্ধেই কথা বলছে ?

না, চড়ে ওঠবার সাহস নেই মনোজের। তাই অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু এসব কথা তো ওঁদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে ?

যাচ্ছে! ওই আনন্দেই থাকো! বিচ্ছু ছেলেটি জানে না যেন, যে, ওরা ভাববেন এ কথা ওর নিজস্ব কথা নয়। শোনা কথা! তাহলেই বোঝো অপদস্থটা কে হচ্ছে ?

মনোজ আরো অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু আমরা তো আর এ সব কথা—

বলিনি ঠিকই। তোমার ওই শয়তান ছেলেটি যে কথার হাওয়ায় বুঝতে পারে। আমার মা বলেন না, সেই যে বলে না উড়ে যায় পাখি, তার গুণতে পারে আঁখি ? তোর ছেলেটা মিতু ঠিক তাই।...এতোটুকু কখন কি বললে তাতে রং চড়িয়েছে।

কিন্তু এসব কথা তোমায় বলল কে ? মনোজ প্রায় ভেঙ্গে পড়া ভাবে বলে, মা ? না বাবা ?

অমিতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, ওঁরা বলতে যাবেন কোন মুখে ? খুব মিথ্যে কথা তো আর নয়। গীতার মার গীতাটি নাকি সেখানে বসে পুজোর বাসন না কি মাজছিল, সব শুনেছে। বলল এসে আমায়।

মনোজের মনের মুখটা বলে উঠল, তা বলবে বৈকি! ওটি যে তোমার গুপ্তচর জানি না আমি? সারাদিনের সব কথা রিপোর্ট করে তোমায়।

মনের মুখ তো সর্বক্ষণই কথা বলে চলে মানুষের। তাকে থামিয়ে রেখে বাইরের মুখেই কাজ।

বাড়ি গিয়ে যে কী করে মুখ দেখার তাই ভাবছি।

আশ্চর্য! তুমি কি প্রকাশ করতে বসবে, এ সব কথা তোমার কানে এসেছে।

মনোজ অস্বস্তির গলায় বলে, তা ছেলেটাকে তো শাসন করা দরকার। করতে গেলেই—

সত্যি! কী চমৎকার বুদ্ধি তোমার। ব্যাপারটা ওপন করলে, আর রইল কী? যতক্ষণ না গিয়ে উঠছি ততক্ষণ আমি কাউকে জানতে দিতে চাই না। তোমার 'হিতৈষী' আত্মীয় জনের তো অভাব নেই। কে কখন তোমার মা বাবার দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়ে ভাংচি দিতে বসবে কে জানে।

এখন অমিতার মনের ভিতরকার মুখ বলে ওঠে, তা ছাড়া, ওই মহিলাটির তো অনেক রকম। শনি মঙ্গল, মাদুলী কবচ, মানৎ টানৎ তুকতাক কত কী! অবস্থাকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে আনতে, কিছু করে বসবে কি না বিশ্বাস আছে?

মুখে বলল, খবরদার, ওসব কথার দিক দিয়েও যাবে না। আমি কালই তাতাইকে নিয়ে আমাদের ওখানে চলে যাব। ওখান থেকে স্কুলে যাওয়া সুবিধা ভিন্ন অসুবিধের নয়।

তাতাইকে নিয়ে হঠাৎ—মানে কী বলবে?

কী আবার বলব? ফোনে হঠাৎ মার খুব শরীর খারাপ শুনে—

মনোজ কী বলে উঠবে, বিষের চারা মানে কী অমিতা? কুশিক্ষা মানে কী?

না, সে কথা বলে ওঠবার দুঃসাহস নেই মনোজের। কথা বলতে হয় নিক্তির ওজনে। বলল, তা তো বলবে, ছেলেটি আবার যা তুখোড়। হয়তো গিয়ে দেখে বলে বসবে, কই অসুখ? তুমি মিছে কথা বলেছ।

আচ্ছা, ওখানে গিয়ে কী হবে না হবে সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। আমার মা তোমার মতন বুদ্ধু নয়। যেই আমি গিয়ে হৈ হৈ করে বলব, মা, তোমার এতো শরীর খারাপ, শুনে আমি ছুটে দেখতে এলাম আর তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ? সেই বুঝে ফেলে বললেন হঠাৎ খুবই খারাপ হয়েছিল রে। আজ একটু ভালো আছি। পরিস্থিতিকে নিজের মুঠোয় ভরে ফেলবার জন্যে কিছু বুদ্ধির দরকার বুঝলে?

তা পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলে অমিতা।

মায়ের হঠাৎ হার্ট ট্রাবলের জন্যে ডাক্তারের নির্দেশে 'কমপ্লীট রেষ্ট' নিতে হচ্ছে বলে, অমিতাকে ওখানে কিছুদিন থেকে যেতে হয়েছে। ওখান থেকে অফিস যাওয়া আসা এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। তাতাইয়ের তো কোনো সমস্যাই নেই।

অফিস যাচ্ছে? তবে মায়ের কতটুকু কী উপকারে লাগছে?

তা মেয়েটার উপস্থিতিই উপকার। নিঃসঙ্গতা নিবারণই ওষুধ। স্বামীটি তো তাঁর রাতদিন বিজনেসের উন্নতির ধান্ধায় ঘুরছেন। তবে অমিতাকে তো আর গিয়ে মায়ের বাড়ির রান্নাঘরের ভার নিতে হয় না! এমন ভাল পুরনো লোক আছে, তাকিয়ে দেখতে হয় না।

শুচিবাইতো নেই, যে 'যার তার হাতে খাব না, বিচার-আচার হ্যানোত্যানো নিয়ে ঝঞ্ঝাট করব।

অতএব কিছুকালের জন্য মনোজের মার কাজ আরো অনেক কমে যায়। প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়। শুধু যা মনোজের সকালের অফিসের ভাত। সেই সঙ্গেই দুটো মানুষের দুটো ভাত তরকারি হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা তো মনোজ অফিস ফেরৎ 'ওখানেই' যায় অফিস থেকে বৌয়ের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরে; তো যতই হার্টের রুগী হোক, শাশুড়ী কি জামাইকে হাতে পেয়ে না খাইয়ে ছাড়বে?

বেশী রাত করে এসে শুয়ে পড়ে খোকা, তার মা বাপের আর তখন ছেলের সাথে গল্প-গাছার উদ্দেশ্যে কথা বলতে সাহস হয় না।

বড়জোর বাবা বললেন, হ্যাঁরে কেমন আছেন বৌমার মা? আর কতদিন ওখানে থাকবে ওরা?

মনোজ বলে, ওদের কথা ওরাই জানে বাবা। তো ওদেরও তো একটামাত্র মেয়ে।

মা বলেন, তাতাইটা বাড়ি না থাকলে বাড়ি যেন শূন্যপুরী, ভূতেরবাড়ি।

মনোজ বলে, তা'কেন! বরং বল যে ভূতের নেত্যটি হচ্ছে না। বেশ তো রেষ্টে আছো বাবা! থাকো-না। খাটতে খাটতে তো জান নিকলে যায়!

হ্যাঁ, এইভাবে চালিয়ে চলতে হচ্ছে মনোজ নামক হতভাগ্য লোকটাকে। অনভ্যাসের দরুন ক্রমশঃই আর মায়ের কাছে বসে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলে উঠতে পেরে ওঠে না। লজ্জা করে। মা যদি বুঝে ফেলেন, বৌ বাড়ি নেই বলেই, ছেলে সাহস করে তাঁর সঙ্গে সহজ হয়ে তাঁর কাছে এসে বসেছে!

না, সহজ হওয়া তো আর নেই।

সহজের পালা অনেকদিন ঘুচেছে মনোজের। কোন্ কথাটা বলবে, আর কোন্ কথাটা বলে ফেলবে না, তা ভেবে উঠতে না পেয়ে 'হাঁ, না, আচ্ছা, ঠিক আছে,

এই দিয়েই চালায়।

তাছাড়া ওঁরাও তো ক্রমেই নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে চলেছেন।

ওঁরাও তো ভয় পান, কোন কথা থেকে কোথায় না জানি মান সম্মানে গিয়ে আঘাত লাগে!

চিরকালই 'বাজারদরটা' হচ্ছে মনোজের বোকা-সোকা বাপটির সব থেকে প্রিয় প্রসঙ্গ।

বরাবরই বাজার থেকে ফিরে কিছুক্ষণ সেই প্রসঙ্গ চালানোই তাঁর অভ্যাস!

অবিবাহিত পুত্র আর তার জননীটি কর্তার কান বাঁচিয়ে হাসাহাসি করছে। ওই হলো আরম্ভ। এখন বসে বসে শোনো, প্রতিটি জিনিসের দর কীভাবে আকাশে উঠে চলেছে।

বাবা বলেছেন, তা' শুনতে হবে না? জানতে হবে না? কাঁচালঙ্কার কিলো কুড়ি টাকা, শুনেছো কখনো?

মা অবলীলায় বলেছেন, আমার জেনেও কাজ নেই শুনেও কাজ নেই, ও তোমার একশো টাকা কিলো হলেও দৈনিক একমুঠো করে কাঁচালঙ্কা আমি খাবোই!

এখন না কি মা আর কাঁচালঙ্কা খায় না। শুনি নাকি খেলে বুক জ্বালা করে। হয়তো সেটা সত্যিই, কারণ কাঁচালঙ্কার মধ্যে তো সে গুণ বিদ্যমান আছেই।

কিন্তু মার এই বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্মত বর্জনের পিছনে কী শুধুই কাঁচালঙ্কার ওই গুণটিই বিদ্যমান?

সাহস করে মাকে জিজ্ঞেস করতে যাওয়া যায় না।

অমিতা বলে, নাকি, তুচ্ছ কথাকে উচ্চ করে তোলা তোমাদের এই বাড়িটির এক স্বভাব।

কবে বুঝি তাতাই বলেছিল, রোজ এতো গাদাগাদা কাঁচালঙ্কা খেয়ে খেয়ে তুমি একদিন মরবে দিদা।

দিদা বললেন, 'কাঁচা পাকা কোনো লঙ্কা না খেলেও মরবই একদিন।' তা' বাচ্চা-ছেলে সর্বদা যা শোনে, তাই বলে ফেলে। বলেছে, আর কাঁচালঙ্কার যে এত দাম, তার বেলা?

সেই তুচ্ছ কথাটা নিয়ে—ভাবা যায় না। যেখানে একটা বাচ্চা ছেলের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বেড়ানো হয়, সেখানে বাস করা কত দুরূহ তা' ভেবে দেখেছ?

বহু কথাই ভেবে দেখবার অনুরোধ আসে মনোজের কাছে। অথচ ভেবে দেখাটাতেই মনোজের আতঙ্ক।

ভেবে দেখলে তো বলে উঠতেই পারতো ছোট কথা যে, বড় করে ভাবার ব্যাপারে আমার মুখ্যু মা, তাঁর গ্র্যাজুয়েট বৌয়ের কাছে শতগুণে হেরে যাবেন অমিতা।

বাবার সেই প্রিয় প্রসঙ্গটিও তো বাবা ত্যাগ করেছেন। তাতে তো বাবার বুকজ্বালা করার প্রশ্ন ছিল না? অথবা ছিল। অমিতা সেই একদিন ওই প্রসঙ্গের মাঝখানে হঠাৎ বলে ওঠো নি তুমি, ওসব আর আপনার ছেলেকে শুনিয়ে কী হবে বলুন? যাদিত তার বেশী দেওয়া তো আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়? শুনে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল অমিতা। আর আমি তার প্রতিবাদ মাত্র না করে, না শোনার ভান করে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এসেছিলাম। একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলাম তোমার কাছে। আড়ালে বলেছিলাম, বাবার তো ওই বাজার দর নিয়ে হা-হুতাশ চিরকালের রোগ, হঠাৎ ওভাবে কথাটা বলতে গেলে কেন?

তুমি একটুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, 'খোকা' নামটিই তোমার সার্থক নাম। অবশ্য সবসময় সব কথা তোমার কানে আসে না। প্রতিনিয়তই তো আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ওই হা-হুতাশ চলে। আমি তার মানে বুঝি না? নিজের পেনসনটি নিয়ে যে কী করেন গড্ নোজ্। ঠাকুরের মিষ্টিই আসছে রাতদিন।

তবে? 'ছোটকথা'র মানে জানো না তুমি?

মাঝেমাঝে মনে হয়, মার সেই সদা-হাস্যময়ী আহ্লাদে ভাসা মূর্তিটা কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায় গেল সংসারের সেই সরসতা, অকারণ কৌতুকের সুখ। মার তো কথা বলার ভঙ্গীই ছিল কৌতুকের। আমারও কম নয়। আর বাবাকে নিয়ে কৌতুক করাটা আমাদের মাতাপুত্রের ছিল একটা নির্মল খুশীর উৎস।

সেই সরসতা, সেই অকারণ কৌতুক, বাড়িতে কেউ এলে আহ্লাদে ঝলমলিয়ে হাসি গল্প সব হারিয়ে গেছে। এখন মরুভূমিতে ওয়েসিস, শুধু তাতাই। কিন্তু সে তো জীবনের বনেদ নয়! আমাদের জীবনের বনেদ থেকে, সেই অকারণ পুলকের পিলারগুলো ভেঙে পড়েছে।

এখন সংসারটা যেন একখানা ভারী পাথরের মত সকলের মাঝখানে চেপে বসে আছে।

অকারণ কৌতুক, অহেতুক উল্লাস, এসবের নির্বাসন ঘটেছে এবাড়ি থেকে।

পরিহাস পরিপাক করবার ক্ষমতা তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমায় দেননি অমিতা। পরিহাসকে ভাবো উপহাস, কৌতুককে ভাবো ব্যঙ্গ। অতএব আমার স্বভাবটা পাল্টাতে হয়েছে। স্বভাব জিনিসটা যে মরেও পাল্টায় না। এ প্রবাদটাই ভুল। পাল্টায়। আমূল পাল্টায়। আমাদের মতো মেরুদণ্ডহীনদের আদ্যোপান্ত পাল্টে যায়।

ম্রিয়মান এক প্রৌঢ় দম্পতির কাছ থেকে প্রায় পালিয়ে এসেই অনেকক্ষণ এই হতাশা আর অপরাধ বোধের শিকার হয়। ভাবে উপায় কি? একদা 'পতিব্রতা

পত্নী' ছিল আদর্শ, এখন যদি বশংবদ পতিই আদর্শ হয়, হতেই থাকবে।

হঠাৎ একসময় শূন্যশয্যা যেন একটা অস্থিরতা এনে দেয়। অকারণ এতোগুলো দিন মিতাকে আর তাতাইকে ছেড়ে থাকতে হবেই মনোজ হতভাগার। নিত্য দেখা হয় ঠিকই, তবু রাত্রে শূন্য শয্যা, শূন্য ঘর বড় যন্ত্রণাদায়ক।

উঠে জল খায়, পাখার স্পীড বাড়ায়, এবং প্রতিজ্ঞা করে, নাঃ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফ্ল্যাটটায় পজেশন পাবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে থাকা যায় না। অমিতার যখন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ওখান থেকেই নতুন বাড়ি চলে যাবে। ছেলেকে আর দূষিত পরিবেশে নিয়েও আসবে না।

অমিতার মা অবশ্য এই নির্লজ্জ ঘটনাটিকে একটি 'কালার' দেন, বলেন,নিজের সংসার হলে, আর তো মিতু নিজের ঘর গেরস্থালী ফেলে আমার কাছে এসে দশবিশদ্দিন এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে না? পেয়ে নিই ওকে একটু।

ও মা!

মিতু আহ্লাদে গলায় বলেও ওঠে, পেয়ে নেওয়াটা আমি ছাড়বো নাকি? তখন তোমাকে তোমার ঘর গেরস্থালী ছেড়ে আমার কাছে গিয়ে থাকতে হবে না?

শোনো মনোজ মেয়ের কথা।

মনোজের দাঁতের আগায় একটু হাসি ঝুলে পড়ে। অমিতা বলে দেখো হয় কিনা। দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতিকে সরস আর আহ্লাদে করে তোলবার ক্ষমতা অমিতার নেই তা নয়।

তবে আর কী করা?

এই আলো ঝলমল পরিবেশে গা ভাসিয়ে দেওয়াই আরামের।

ভবানীপুরের বাড়ির সেই কম পাওয়ারের আলোওলা খাবার ঘরে সাধারণ সান-মাইকা পাতা একটা শ্রীহীন টেবিলে শীর্ণ ম্রিয়মান প্রায় নীরব মার কাছে বসে রুটি তরকারি খাওয়ার ছবিটা মনে পড়লে ভয় করে মনোজের।

তবে সমস্যা—তাতাই।

প্রতিদিন সে বাপীর সঙ্গে বাড়ি যাব বলে কাঁদাকাটা, রাগারাগি চালিয়ে যাচ্ছে। বলছে তোমাদের নতুন ফ্ল্যাটে আমি যেতে চাই না। আমি দিদার কাছে দাদুর কাছে থাকব।

মূর্তিটা তখন তাতাইয়ের হিংস্র লাগে। তাতাইয়ের এই ভয়ংকর মূর্তি দেখেই তো আরো একদিনের জন্যেও পাঠাতে রাজী হয় না অমিতা। আড়ালে ওর মাও বলে, খবরদার না। দেখছিস না মূর্তিটা ছেলের। নির্ঘাৎ বশীকরণটরণ কিছু করা হয়েছে।

এটা অবশ্য শুনতে পায় না মনোজ তবে জোর করতেও সাহস করে না। যদি জেদী একগুঁয়ে রাগী ছেলেটা আর আসতে না চায়।

বড্ড কিছু করলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসাটা তো লজ্জার। কোন্ মুখে সেটা কববে মা বাবার সামনে!

আবার ছেড়ে দিলে, কোন মুখে খালি একা গিয়ে দাঁড়াবে অমিতার 'ও বাড়িতে।' কোন্ মুখে বলবে, আসতে চাইল না। ওরা ধরে নেবে, এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ব্যাপার।

উঃ। উঠে পড়ে লেগে, ফ্ল্যাটটায় গিয়ে পড়তে পারলে হয়।

তবু একদিন মনোজ ছেলেকে একটুক্ষণ একা পেয়ে বলেছিল, এতই যদি ইয়ে তা সেদিন দাদু দিদাকে বলেছিলি কেন, আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে তোমাদের নিয়ে যাব না। তোমরা নোংরা বিচ্ছিরী।

তাতাই লাল লাল মুখে বলেছিল, সে তো মজা করে।

মজা করে তুমি খারাপ খারাপ কথা বলবে? জানো এই জন্যেই দাদু দিদা তোমার ওপর রেগে গিয়ে তোমায় আর পচা বাড়িতে থাকতে হবে না বলেছেন, বলেই তোমার মাম্মী তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে।

তাতাই একটুক্ষণ বাপের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে, তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ।

মনোজ কি ওই তীব্র তীক্ষ্ণ টর্চের মতো দৃষ্টির সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যাবে? যেতে পারলে হয়তো ভেতরে এমন যন্ত্রণা কুরে কুরে খেত না মনোজ নামের লোকটার। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া তো চলে না।

তাই আবার বলতে হয়, কেন বানিয়ে? অত খারাপ কথা শুনে দাদুদের অপমান হতে পারে না?

তাতাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলেছিল, তুমি যাও, তুমি চলে যাও। এক্ষুণি চলে যাও সেই পচা বাড়িতে। আমি আর কখনো যাব না।

হ্যাঁ, এতে কার্যসিদ্ধি হয়েছে বটে মনোজের। সেদিন থেকে আর একবারও বাড়ি যাব বলে বায়না করে নি তাতাই। কিন্তু মনোজ?

হ্যাঁ, শিশুকে প্রবঞ্চনা করার যন্ত্রণা যে খুবই যন্ত্রণাদায়ক, তাতে সন্দেহ কী! এর নামই কি বিবেকের কামড়?

তা সে যন্ত্রণা আর কদিন থাকে আপাত শান্তিপ্রিয় লোকেদের?

দেখা গেল সেই আপাত শান্তিটা এসেছে। তাতাই আর বাবা বাড়ি ফেরার সময় কাছে এসে ঝুলে পড়ছে না। শেষ অবধি বিদায় দিতে অমিতা একাই গেট অবধি

আসছে। তাতাইয়ের নাকি তখন ভীষণ ঘুম পেয়ে যায়। যাকগে ভুলে যাবে। শিশু তো দু'দিন বাদে ভুলে যাবে। এখন তো স্বস্তি। ও কি আর পরে জেরিফাই করতে যাবে, কে কী বলেছিল বলে?

এইভাবেই তো 'সুখ' কেনা। ক্ষুদ্রতা দিয়ে, তুচ্ছতা দিয়ে, ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের মিথ্যাচার দিয়ে, বিবেকের কামড়কে সয়ে নিয়ে নিয়ে।···কত মিথ্যার জাল রচনা করে করে অমিতাও তো তার জীবনের সুখটুকু কিনতে পারছে।
অমিতাও ছন্দার মতো, রেখার মতো, একটা সত্যিকার জীবন পাবে, এ স্বপ্ন সফল করতে কিছু খানিকটা বিকোনো যায়। শ্রেয়র বদলে প্রেয়, এ তো চলছেই।
মনোজকেও তো শুধু ছোটই নয়, বড় কিছুও বিকোতে হয়েছে। মনোজের যা আয় তাতে কি আর সল্টলেকের সেই ছবির মতো ফ্ল্যাটটি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল?
মনোজ মনকে ঠিক দিয়েছে, যা সবাই করছে, করে পার পাচ্ছে, তা মনোজই বা না করবে কেন? সততা শব্দটার কি আজকাল চল আছে?

অমিতার মা অবশ্যই বেশ আধুনিকা, কিন্তু অমিতার 'বাপী' (যিনি একদা বাবাই ছিলেন, এখন বাপী হয়ে গেছেন) তিনি ধুয়ো ধরলেন, দিনক্ষণ পাঁজী-পুঁথি দেখে গৃহপ্রবেশ করতে হয়। ফ্ল্যাট বাড়িতে তো আর ভিৎপুজা হয় নি। অতএব আবার কিছুদিন অপেক্ষা।
কিন্তু অমিতার ভাগ্যের শনি যে এই ভাবে শত্রুতা সাধবে, কে জান তো?
অবশ্য এমন নাটকীয় ঘটনা তো অহরহই ঘটে চলেছে বিশ্বসংসারে। নতুন আর কি?
এখন আর ফ্ল্যাটটাকে লুকিয়ে রাখা চলে না। তাই অমিতাই বলে বলে মনোজকেই বধ্যভূমিতে পাঠায় হাড়িকাঠে গলা দিতে। 'বলবে, আস্তে আস্তে বলবে।'
এখন আর বিদায় বেলায় তাতাই আর গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসে না বলে অমিতা একা পায় মনোজকে। বলবার সুবিধে। অফিসে সে ছুটি নিয়ে বসে আছে কদ্দিন নতুন বাড়ির সাজসজ্জার জন্যে মায়ের সঙ্গে কেনাকাটায় বেরোতে।
গেটের ধারটা ছায়াছায়া।
মনোজ বলল, আর পারা যাচ্ছে না। রাত্তিরে বিছানাটা ছুঁতে ইচ্ছে করে না।
অমিতা বলল, আমারই যেন কিছু হয় না। কেমন?
তোমার কাছে তবু তাতাই থাকে।

আর বোলো না—সে তো আবার আজকাল পাকামি করে ক'দিন দাদুভাইদের কাছে শুচ্ছে। দাদুভাই নাকি ওকে গ্যালিভরের গল্প শোনাচ্ছেন। দাদুভাইয়ের ঘরে।

হঠাৎ ধ্বক করে উঠলো মনোজের। একদিন চারুলতার কাছে গল্প শুনতে শুনতে তাতাই 'দিদার কাছে শোব' বলে বায়না ধরেছিল। ওঁরা বলেছিলেন 'থাক না বাবা, এত এমন করছে।'

কিন্তু একটু পরে মনোজকেই এসে, হাত পা ছোঁড়া অবস্থায় ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে হয়েছিল, 'ছেলে ছেড়ে ওর মা ঘুমোতে পারছে না' বলে।

ছেলে ছেড়ে ঘুমোতে পারে না অমিতা মনোজের জানা। পারে, এটা অজানা।

তা মনোজের জানার বাইরে কত অজানা বস্তুই তো আছে। মনোজ তাই ছেলের 'পাকামি'র কথা শুনে শুধু বলল, 'তাই বুঝি'।

ভদ্রতা, সভ্যতা আর পায়ের তলার মাটি বজায় রাখতে পুরুষ জাতকে এমন কত কিছুকেই শুধু 'তাই বুঝি' বলে আলগা হয়ে ছেড়ে দিতে হয়।

সবসময় যদি 'জোঁকের মুখে নুন' দেবার চেষ্টা করতো, তাহলে আর যাই হোক্ সংসার করা হতো না তার।

অমিতা বলল, হ্যাঁ। খেয়ালের ওপরই তো চলে তোমার ছেলেটি। যাক যা বলছিলুম, একেই তো বাপী ওই এক পাঁজীপুঁথির ব্যাপারে ফ্যাচাং তুলেছে, আবার এখন বলছে 'গৃহ প্রবেশের সময় তোর শ্বশুর শাশুড়ীকে একবার আনা উচিত।' নইলে নাকি শুভ লক্ষণ হবে না। আবার নাকি লোকে নিন্দেও করবে। অথচ মা বলেছিল, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবস্থা করে, তবে একদিন ওনাদের নিয়ে যেতে। গেলে নাকি একটা রাত বাস করতে হয়। বাপী না এতো সব মেয়েলীপনা জানে। হি হি, নিজের যেগণেশ ওল্টাবার ভয়ে সব সময় পাঁজীপুঁথি শুভ-অশুভর কারবার। তা বাপী যখন বলেছে, তখন না কয়িয়ে ভো ছাড়বে না। আজ সবটাই শুনিয়ে খুলে বলে, ওটাও বল গিয়ে। মনোজ কল্পনা করে নিল, ওই প্রস্তাবটা নিয়ে ও মা বাপের সামনে পেশ করছে।

ভীষণ রাগ হলো মনোজের।

ওঃ বটে। তোমার বাপীটি যখন ধরেছেন, তখন না করিয়ে ছাড়বেন না। আমি শালা তোমার ফরমাস খাটার চাকর।

বলতে মুখে আটকালো না? মা বাবাকে আমি—

তবে রাগ চাপাই বশংবদ স্বামীর কর্তব্য। তাই খুব নরম গলায় বলল, আমার মনে হয়, এটা তোমাদের নিজের গিয়ে বললে ভালো হয়।

দপ্ করে জ্বলে উঠল অমিতা।

বলল, কেন, তোমার সাহস হচ্ছে না? তুমি ছেলে, তুমি বলতে পারবে না, আমাকে গিয়ে বলতে হবে? আচ্ছা, কেন যে তুমি এতো নার্ভাস, তা জানি না। আমার পক্ষে গিয়ে বলা সম্ভব নয়। যদি কথা না রাখেন, আমার মানটি কোথায় থাকবে ভেবে দেখেছ?

কোথায় থাকবে, সে উত্তর দিতে পারল না মনোজ। অতএব তাকে রাজী হতেই হলো।

অমিতার মান চলে যেতে পারে, এমন ঘটনা তো ঘটানো যায় না। তবু—কী ভাবে বলা যায়, সেই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে অতঃপর বিদায় নিল মনোজ। অনেক রাত হয়ে গেল আজ!

কত রাত হচ্ছে আজ খোকার। অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্ করছেন চারুলতা। স্তব্ধ রাত সারা পাড়া নিঃঝুম।

গীতার মার গীতাটা দালানের কোণে নিজের বিছানাটি পেতে শুয়ে পড়েছে। তাকে দিয়ে কী বা হবে?

শোবার আগে সে একবার কর্তব্য করে জিজ্ঞেস করেছে, তোমরা খাবেনি? মেশো-মশায় তো শ্বশুর বাড়ি থেকে খেয়েই আসে।

চারুলতা সংক্ষেপে বলেছেন, তোর দাদুর শরীর ভালো নেই।

তো তুমিও খাবে না?

না।

কি হয়েছে দাদুর?

বুক ব্যথা করছে।

বুক ব্যথা। 'তা' একটু নুন যোয়ান খাইয়ে দ্যাও। ভালো হয়ে যাবে।

বলে শুয়ে পড়েছে সে। তা' সেও অনেকক্ষণ। ছেলেটা এত দেরী করছে কেন? কী হলো! তারই বা কী হলো? তাতাইটা ভালো আছে তো?

স্বামীর জন্য ভাবনাটা দশগুণ বেড়ে যাচ্ছে ছেলে আর নাতির চিন্তায়। অসুখ-বিসুখ করেনি তো তাতাইয়ের? রাস্তায় খোকার কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো? যা গাড়িটারির অবস্থা আজকাল! এদিকে অবিনাশ মাঝে মাঝে উঃ আঃ করছেন, উঠছেন, জল খাচ্ছেন আর 'খোকা এখনো এল না?' বলে আবার বুকে হাতটা চেপে শুয়ে পড়ছেন।

চারুলতার মনে হচ্ছে হঠাৎ তাঁকে কিছুতে একটা গ্রাস করতে আসছে। চারুলতা

যেন কোথা থেকে কী একটা সংকেত পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, এই গভীর হয়ে আসা রাত্রির স্তব্ধতা, এই চারিদিক নিঃঝুম হয়ে যাওয়া, অবিনাশের এই এক আচ্ছন্ন ভাব, যে রকমটা আগে কখনো দেখা যায় নি। এ সমস্তই যেন ভয়ানক একটা অশুভবাহী!

ছেলের ওপর দুরন্ত একটা রাগ অভিমান হচ্ছিল এতক্ষণ, ভাবছিলেন, এসে দাঁড়ালেই বলে উঠবেন, ছি ছি খোকা, তুই এমন হয়ে গেলি? এত অপদার্থ? একবারও ভেবে দেখতে ইচ্ছে হয় না, কী ছিলি তুই আর কী হয়েছিস!

ঘোরঘোর আচ্ছন্ন হয়ে থাকা স্বামীর কাছে শুধু গায়ে হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না চারুলতা। মাঝে মাঝে শুধু ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন, ঘাম হচ্ছে না তো? বেশী ঠাণ্ডা লাগছে না তো?

গাটা যদি জ্বরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, তাহলে বুঝি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন চারুলতা। জ্বর এলে এমন অঘোর ভাবটা বরং স্বাভাবিক।

কিন্তু কই? গা তো ঠাণ্ডা পাথর! খোকা না ফেরা পর্যন্ত ডাক্তার ডাকার কোনো উপায় নেই।

একবার ভাবলেন, গীতাকে ডেকে কি একবার সুজিতবাবুর বাড়ি খবর পাঠাবেন? ওদের ফোন আছে, যদি কোনো ডাক্তারকে—

ভাবছেন আবার পিছিয়ে যাচ্ছেন। রাত এগারোটায় পড়শীর ঘুম ভাঙিয়ে ডাক্তার ডাকার মতো কিছু না হয় যদি। যদি তারা বিরক্ত হয়?

কিম্বা খোকা যদি সেই মুহূর্তে এসে পড়ে?

সে কি নিজের অপরাধটার কথা একবারও স্বীকার করবে? না, মার অসহায়তার কথা বুঝবে? যে মানুষটার ওপর নির্ভর করে জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চারুলতা, সেই চোদ্দো বছর বয়েস থেকে এই চুয়ান্ন বছর বয়েস অবধি! সে মানুষ চোখ বুজে পড়ে রয়েছে আচ্ছন্নের মতো। চারুলতার জীবনের সেই ভিৎটা যে কেঁপে উঠছে। এ সব কথা বুঝতে চেষ্টা করবে খোকা?

করবে না। এখন আর মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে না সে! অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে। বরং নিজের অথবা বৌয়ের ঔদাসীন্য অবহেলা আর নির্লজ্জতার পাল্লাটা ভারী হয়ে উঠতে দেখলে, মার পাল্লায় চাপিয়ে ফেলছে কিছু ঢিল পাথর ভাঙা ইঁট।

মা অসহিষ্ণু, মা অধৈর্য, মা অবোধ, মা বিবেচনাহীন! মা যদি কখনো ছেলেকে 'নিজের লোক' ভেবে নিজস্ব কিছু দুঃখ বেদনার কথা বলতে চেষ্টা করেছে কান পেতে শুনতেই চায় নি খোকা। 'তোমার এসব ধারণার কোনো মানে হয় না'

বলে দুঃখটাকে 'কাল্পনিক' বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

চারুলতা নামের মানুষটা অহরহ অকারণ অপমান, অকারণ নির্মমতায়, নিঃশব্দে তিলে তিলে ক্ষয় হতে হতে যে সব জোর হারিয়ে ফেলতে বসেছেন এ সত্য স্বীকার করবার সাহস আর ওর নেই। চারুলতার ওই রূপান্তরিত ছেলেটার। তাই মাকেই বলে ওঠে, তোমার ভুল, তোমার অন্যায়, তোমার নিজের মন থেকে তোলা দুঃখ। এখনও তাই করবে।

রাত করে বাড়ি ফিরে যদি দেখে মা পাড়ার লোকের সাহায্যে ডাক্তার এনেছে, নিজের অপদস্থ হওয়ার গ্লানিটা মুছে ফেলতে, রেগে বলে উঠবে, এর কোনো মানে হয় না। একটু বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। পাড়ার লোককে ঘুম ভাঙিয়ে জ্বালাতন করবার মতো কী এমন হয়েছিল?

হ্যাঁ, সেই নিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে চারুলতা গীতাকে ডেকে তুলে পাড়ার লোকের শরণাপন্ন হতে সাহস করছেন না।

তাই এই আধ ঘুমন্ত মানুষটার গায়ে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে ভেবে চলেছেন।

'বুকের পাটা' বলে নাকি একটা শব্দ আছে চলতি বাংলায়।

চারুলতা কখনো সে শব্দটাকে জানেন নি। চারুলতা চিরকাল শুধু সকলকে ভয় করে এসেছেন। আর সকলের মন রক্ষা করবার চেষ্টা করে এসেছেন। 'শাশুড়ীর বৌ' থাকাকালীন অবস্থা থেকে 'বৌয়ের শাশুড়ী' হওয়া পর্যন্ত একই পদ্ধতি চারুলতার।

এখন চারুলতা 'বুকের পাটা' শব্দটার মানে বুঝছেন, বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দেখে দেখে অনুভব করছেন, 'বুকের পাটা' মানে কী!

তবু নিজে সে 'পাটা'টাকে সংগ্রহ করে এনে বুকের মধ্যে বসিয়ে তাকে মজবুত আর শক্ত করে তুলতে পারবেন, এমন ক্ষমতা নেই।

কতবার ভাবছেন, খোকা রাগ করে, বয়েই গেল। মুখের ওপর বলে দিতে পারব, 'তোমার শ্বশুরবাড়ি লীলা' সাঙ্গ করে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মানুষটা যদি মরে যেত?

ওই ভাবাই সার।

এ ভয়ও তো আছে, যদি ডাক্তার এসে বলে 'কিছুই হয় নি।' তা'হলে? তাহলে তো সবটাই ধাষ্টামো।

ভগবান! ছেলের কাছে অপদস্থ হবার ভয়ে আমি ঠিক করছি না ভুল করছি?

স্বামীর চোখ বন্ধ, মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না চারুলতা, অন্যদিকে তাকাচ্ছেন। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। ওই আকাশটার মধ্যেই বুঝি

অভয় আর আশ্রয় !

আচ্ছা, ঠিক কখন শরীরটা খারাপ হলো অবিনাশের ? দুপুরে তো ঠিকমতই ভাত খেয়েছিলেন। বাজারেও গিয়েছিলেন সকালে। বলেছিলেন, ভালো সাঁতরাগাছির ওল পেলাম, নিয়ে এলাম খানিকটা। আগের মতো নারকেল কোরা আর মটর-ডালের বড়া দিয়ে রেঁধো তো কাল।

চারুলতা মনঃক্ষুণ্ণভাবে বলেছিলেন, এত তরিবৎ করে রাঁধব, কে বা খাবে! খোকাটা সুদ্ধু কবে থেকেই এসব ছেড়ে দিয়েছে।

অবিনাশ একটু হেসেছিলেন।

বাঃ! আমরা বুঝি আর মানুষ নই ? আমরাই খাব।

তারপর একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, এখনো খোকা নামকাওয়াস্তে একটা বেলা দুটো খাচ্ছে, এরপর তো সেই তুমি আর আমি। বুড়ো আর বুড়ি।

এই একটা যন্ত্রণা এই মানুষটাকেও জীর্ণ করে ফেলছে। ওরা আর এখানে থাকবে না। ওর এই বাসাটাকে খড়কুটোর মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে নিজের তৈরী নতুন বাসায়।

যাক, যেখানে থাকুক, ভালই থাকুক, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এমন সতা সতীনের মতো ব্যাভার করছে কেন বল তো চারু ? কেন এতদিন আগে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল! একবার আমাদের দেখতে পর্যন্ত দিচ্ছে না ? আমরা কি ওদের ছেলেকে কেড়ে নেব ? আটকে ফেলব ? সে ক্ষমতা আছে আমাদের ? আর ওর বাসা ? নতুন বাসা সেও কি খেয়ে ফেলব আমরা ? এতো লুকোছাপা কেন ?

এতো লুকোছাপা সত্ত্বেও, খোকার নতুন বাসার খবর তো জানা হয়ে গেছে এঁদের।

তাতাইয়ের সেই উদ্ঘাটনের পরদিনই তাতাইকে নিয়ে চলে যাওয়া, আর তাকে দেখতে না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে আর অসুবিধে হয় নি। খোকা বাসা করছে, দেড়লাখ টাকা দিয়ে ছবির মতো ফ্ল্যাট কিনছে। অতঃপর তো এ, ও, সে, বলছেই এসে এসে।

ওমা। সে কী! ছেলে ফ্ল্যাট কিনেছে, তোমরা জানো না ?

এই না জানাটা যে কী মর্মান্তিক লজ্জার—তা যারা বলে হয়তো জেনে বুঝেই বলে। মর্মান্তিক দৃশ্যটা উপভোগ করতে।

চারুলতা কি অবিনাশ গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছেলের বৌয়ের নিন্দের পশরা খুলে বসেন ? আর 'ভেড়া' বনে যাওয়া ছেলেকে ধিক্কার দিতে থাকেন ? তা'হলে হয়তো ওই শুভানুধ্যায়ীদের করুণা পেতে পারতেন। কিন্তু এঁরা তা না করে ছেলে বৌয়ের

দোষ ঢেকে প্রেষ্টিজ বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। বলেন, ওমা জানব না আবার কেন? তবে বেশী উৎসাহ দেখালে যদি বলে বসে, তোমরাও চলো সেখানে! বাবা তাহলেই তো গেছি।

ঝুনোরা অবশ্য মনে মনে হেসে বলে, তা আর বলেছে! এখনকার বৌ-ঝিরা স্বাধীনতা চায়!

চারুলতার উক্তি, তা চাইবেই তো ভাই। যেকালে যে ধর্ম! আমার এই 'গোবর গঙ্গাজল', ঠাকুর-ঠুকুরের সংসার। ওরা তো প্রাণ খুলে নিজেদের মনের মতো করে থাকতে পায় না বাপু!

এরপর আর কী বলতে পারে তারা, আড়ালে হাসা ছাড়া?

'দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল' এ গল্প তো জীবনের প্রারম্ভেই জানা।

নিজেদের মান সম্মান বজায় রাখতে ছেলে বৌয়ের দোষ ত্রুটি চাপা দিয়েই চলেন চারুলতা। কখনো চান না উদ্‌ঘাটিত করতে। কিন্তু যখন উদ্‌ঘাটিতটা অবধারিত, তখনো যে কেন এই নিষ্ফল প্রয়াস!

আর কিছু না, ওই বুকের পাটার অভাব।

আচ্ছা, বিকেল বেলাও তো ঠিক সময়ে ঠিকমত চা খেয়েছিলেন অবিনাশ! হ্যাঁ, খেয়েছিলেন তো। সেই দুটি মুড়ি। একটু ঘরে কাটানো ছানা নেড়ে তৈরী ছোট্ট একটি সন্দেশ, আর চা। যথারীতিই খেয়েছিলেন।

তারপর সেই নিত্য দিনের আক্ষেপ।

তাতাইটাকে একবার এমুখো হতে দিল না এতদিনের মধ্যে!

চারুলতা কোনো কোনদিনের মতো আজও বলেছিলেন, তা তাতাই তো তোমাকে আমাকে নোংরা বিচ্ছিরী বলে ঘেন্না দিয়ে চলে গেছে। নিজেই হয়তো আসতে চাইছে না।

অবিনাশ আহত হয়েছেন।

কী যে বল। শিশু পাখির জাত, যা শোনে, তাই বলে। ওসব কি ওর নিজস্ব কথা? ওর মা বাপই আটকে রেখেছে।

তাই যদি হয় রোজ রোজ আক্ষেপ করে কি লাভ? এরপর তো খোকাকেও সুদ্ধ আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

তখনকার মতো চুপ করে গিয়েছিলেন অবিনাশ!

হয়তো বা ভেবেছিলেন, চারুলতা মায়া-মমতা-শূন্য হয়ে গেছেন। না হলে এতো অনায়াসে এমন কথাটা বলতে পারলেন!

এই 'অনায়াস'টা দেখাতে যে কত আয়াস করতে হয়েছে চারুলতার, তা বোধহয় এখন অবিনাশেরও বোঝবার ক্ষমতা নেই।

তা' সত্যিকারের কে কাকে 'বোঝে ?'

পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারলে, পৃথিবীতে তো কোনো সমস্যাই থাকত না। চারুলতা ভাবেন আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি অন্যকে বুঝতে। তবু বুঝতে পারি না, শুধু শুধু এসে গায়ে পড়ে অপমান করে কেন ?

এটাই কি ক্ষমতার দর্পের প্রকাশ ?

কেন এমন হয়? ভেবে তো পাই না। আমি তো আমার আমিত্বটাকে বিসর্জন দিয়েই বসে আছি। জেনে এসেছি, মেয়েরা চিরদিন রান্না ভাঁড়ার ঘরে বন্দী থেকেছে, অনেক প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কখনো বাইরের আলোর মুখ দেখে নি, কোথায় পাবে তারা উদারতা ? কিন্তু আজকের যুগের দিকে তাকিয়ে দেখি কী ভুল ধারণাই পোষণ করে এসেছে লোকে এতোকাল। যার যা প্রকৃতি সে তা করে চলবেই। পরিবেশের অমলা হাওয়া কারো মধ্যে উদারতা এনে দিতে পারে না।

এ যুগের মেয়েরা তাদের পিতামহীর ধারা বর্জন করে চলেছে। আচারে আচরণে সাজে সজ্জায়, সংস্কার মুক্তির দুঃসাহসে। কিন্তু ভিতরে লালন করে চলেছে, সেই অন্তঃপুরে আবদ্ধ পিতামহীদের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা, অপরকে অকারণ আঘাত করার বিলাস। তাই আজো মেয়েরাই মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ।

শাস্ত্রে নাকি আছে বিদ্যা বিনয় দান করে। মনে মনে হাসেন চারুলতা। সব কিছুই তো পাল্টে গেছে এ যুগে হাত কাজ করে চলে, মন ভেবে চলে। হঠাৎ সেই ভাবনাটার ওপর ধাক্কা পড়ল। তখন চা খাওয়ার পর ।

অবিনাশ বললেন, চলো চারু আমরা দুজনে কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করিগে। চারুলতা ওঁর মুখের দিকে তাকান নি, রুটি বেলতে বেলতে চির স্বভাবেই হালকার ভান করে বলেছিলেন, হঠাৎ এমন ধর্মে মতি ?

ঠাট্টা নয় চারু, এইসব হিজিবিজি থেকে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কথাটা বলে ঘরে শুয়ে পড়েছিলেন। খানিক পরে চারুলতা যখন বলেছিলেন, খেতে দিই ? তখন বলেছিলেন, তুমি খেয়ে নাওগে। বুকটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। চারুলতা গীতাকে খেতে দিয়ে ঘরে এসে বসেছিলেন। তারপর ? তারপর কি আর কিছু কথা বলেছিলেন অবিনাশ ? মনে পড়ছে না। উঃ আঃ করেছেন, জল চেয়েছেন, উঠেছেন, বসেছেন, তারপর আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েই আছেন।

এখন চারুলতার নতুন ভাবনা ঢুকেছে, নাতির অসুখ করল না তো ? ছেলের রাস্তায় কোনো বিপদ হলো কিনা ! মানুষের বুকের মত ভারসহ 'ধাতু' আর কী আছে ? হঠাৎ অবিনাশ উঠে বসতে চেষ্টা করে বলে উঠলেন, 'নাঃ খোকার সঙ্গে আর দেখা হলো না।' শুয়ে পড়লেন।

সেই সময় গীতার গলায় জোর শব্দ শোনা গেল 'যাই।' নীচে কড়া নড়েছে। কিন্তু চারুলতার আর্তনাদটা ?

সেটা কখন ? কড়ানাড়ার আগে, না পড়ে ?

আর্তনাদটার ভাষা কী ?

'খোকা! খোকারে—'

পরবর্তী আর্তনাদ 'মা'! তাই না ?

কিন্তু এ দৃশ্যের ওপর যবনিকা টেনে দেওয়াই ভালো। কী লাভ এই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন নিত্য অভিনয়ে ঘষা পয়সার মত জৌলুসহীন একটা দৃশ্যকে বসে দেখার ?

সদ্য বিধবার আর্তনাদ, অনুতপ্ত সন্তানের সাময়িক হাহাকার, প্রতিবেশীজনের মৌলিকত্বহীন সান্ত্বনা, মধ্যবিত্তজীবনের এই রঙ্গমঞ্চে, এ 'সীন' বড় একঘেয়ে! বড় পুরনো।

অতঃপর কী কী ঘটতে থাকবে, তা সকলেরই জানা। এক একটি মৃত্যু-ঘটনা সেই জানাটাকে ঝালিয়ে দিয়ে যায় মাত্র!

ছেলে নিয়ে গাড়িতে ওঠার সময়, অমিতা একটা স্থির ধাতব স্বরে বলল, এ আমি জানতুম!

তাতাইকে গাড়িতে তোলা যাচ্ছিল না। একটানা চীৎকার করে চলেছে সে, 'আমি যাব না। আমি যাব না। দাদু কেন মরে গেলো! দাদু কেন মরে গেল!' অনেক কষ্টে গাড়িতে তোলা হলো তাকে। সঙ্গে করে নিয়ে চললেন অমিতার বাপী।

অমিতার বড়মাসী এসেছিলেন সেদিন দৈবাৎই। আসেন তো প্রায়। অবস্থা দেখে থেকে গেলেন, একাকিনী ছোট বোনের কাছে।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, ছেলেমানুষ যেতে ভয় পাচ্ছে, এতো ধরে বেঁধে নিয়ে যাবার কী দরকার বাবা!

অমিতার মা ঝলসে উঠলেন, ও বাবা! না নিয়ে গেলে রক্ষে আছে? যা মাতৃপিতৃ-ভক্ত সন্তান আমার জামাই। মিতুকে একা যেতে দেখলে আকাশ থেকে পড়বেন। ঘেন্না দিয়ে বলবেন, তাতাইকে আনলে না। তুমি কী ?

মাসি বললেন, কী জানি বাবা! এই বাচ্চা শিশুকে একটা মৃতদেহ দেখাতে নিয়ে যাবার মানে আছে কোনো ? আমাদের আমলে, ছোট ছেলের সামনে 'মরা' কথাটা

উচ্চারণই করা হতো না। চুপিচুপি বলাবলি। বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে দেখলে পাড়ার লোকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের। সেখানেই নেয়েছে খেয়েছে থেকেছে শুয়েছে। এখন সবই উল্টট।

অমিতার মা বললেন, আমি ভাবছি, আমার মেয়েটার কপাল বটে একখানা। আহা, ওর দুঃখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। কত কাঠ খড় পুড়িয়ে কত কাণ্ড করে, সুখের মুখটি দেখতে যাচ্ছে, আর এই ঘটনা। আর পাঁচটা দিন পরে মরতে পারলেন না তিনি, আশ্চর্য!

মাসির দার্শনিক উক্তি, একেই বলে রে—পূর্ব জন্মের শত্রুতা। মরেও শত্রুতা সেরে গেল বুড়ো।

খুব ভুল বলিস নি দিদি! মেয়েটা তো একদিনের জন্য সুখ আরাম পায় নি। গেঁয়ো বুড়ো শ্বশুর, শুচিবাই শাশুড়ী আর মাতৃভক্ত স্বামী, এই নিয়েই এতোদিন টেনেছে। আহা! ওই ফ্ল্যাটটির স্বপ্ন দেখেছে কি আজ থেকে? তো যেই না আশার জিনিসটি হাতে এলো, অমনি এই। দুটো মানুষ ছিল, নিশ্চিন্দি। এখন কি সমস্যাটি বাড়ল ভাব!

মাসি নিঃশ্বাস ফেললেন, সেই তো! তোর জামাই কি আর মাকে নিজের কাছে নিয়ে না এসে ছাড়বে? আহা অমন ছবির মতো ফ্ল্যাটটি! কত মনের মতো করে সাজাচ্ছে, সাজাবে, তার মধ্যে ওই সদ্যবিধবা কান্নাকাটি করা শুচিবাই শাশুড়ী! মিতুর সুখের বারোটা বেজে গেল!

সেই দুঃখেই মরছি রে দিদি!

একথা বলা চলে না, এ হেন অমানবিক কথা কোনো মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। 'বৈধব্য' শব্দটা তো তাঁদের কাছে 'করুণ দুঃখময়।'

কিন্তু এমন অমানবিক কথা আপনি উনি তিনি সবাই ঘরোয়া পরিবেশে অনায়াসেই বলে থাকে। সত্যিই তো অমিতার শ্বশুর মরে তার সঙ্গে শত্রুতা করে গেলেন না? কোথায় দুদিন বাদে অমিতা নতুন শাড়ি গহনা পরে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করবে; তা নয় আলোচালের হবিষ্যি করতে বসা!

অমিতার মা বলেন, তোর ভগ্নিপতিটিও তো তেমনি দিদি! মিতুকে বলছিলুম বলে কয়ে মনোজের মাথা কামানোটা যেন আটকায়। ন্যাড়া মাথা নিয়ে ওই নতুন বাড়িতে সভ্যপাড়ায়—ছি ছি। ভাবা যায় না বাবা। তা' তিনি বলে উঠলেন, 'তা বললে চলে? শাস্ত্রবিধি মেনে যদি বাপের শ্রাদ্ধ করে তো মাথা ন্যাড়া করতেই হবে।...বাপটা মরে গেল তার কাছে ন্যাড়া হওয়াটা এতো বড় হলো?' বোঝ?

বুঝি রে। বেটাছেলেরা সব কটাই ভেতরে ভেতরে গোঁড়া রক্ষণশীল। মুখে যতই যা

বলুক, আর নিজেরা যতই সাহেবিয়ানা করুক, মন পড়ে আছে সেই পেছনের অন্ধকারে। এই তোর জামাইবাবু, হঠাৎ হঠাৎ বলে বসবে কী জানিস? 'আচ্ছা মা যে সেই ষষ্ঠি মনসা কী সব করতেন যেন, তুমি কর না সে সব?...আচ্ছা বাজারে দেখি লোকে লক্ষ্মীর ঘট না কি খুব কেনে, এসব তোমাদের লাগে না?' বোঝ। ওর বায়না আমি এখন ওর মা ঠাকুমার মত, লক্ষ্মী, ষষ্ঠি মনসা মাকালী নিয়ে জড়ভরত হয়ে বসে থাকি। আবার বাবা মা-রা তো যা করেন সন্তোষী মা। মিতু বলেছিল, বড় মাসির কাছে ভালো করে শিখে নিও তো মা 'সন্তোষী মা' করাটার নিয়ম-টিয়ম কী? করলে হয়। মাসি চোখটা একবার বুজে নিয়ে বলেন, আগে থেকে করলেই ভাল হতো। তাহলে এমন সন্তোষের 'কালে' এরকম জগা-খিচুরী ব্যাপার হতো না।

এখন আর চিতা জেলে লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে জীবন কী নশ্বর, চিন্তাটা বড় একটা হয় না। সভ্য সমাজে ওটা উঠেই যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ-চুল্লিতে পিতৃদেহটিকে সমর্পণ করে ঘাটের ধারে এসে চুপচাপ ভাবছিল মনোজ, কী অদ্ভুত এই ঘটনাটা ঘটে গেল আমার জীবনে। আর মাত্র দু'মিনিট আগে এসে পড়লেও বাবাকে বলে উঠতে হতো না 'খোকার সঙ্গে দেখা হলো না।'

অথচ আরো অনেক মিনিট আগেই আসতে পারতাম আমি। বাবার সামনে কী করে সেই প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যাবে সেটাই অমিতার কাছে নিখুঁৎ ভাবে 'পাঠ' নিতে নিতে, সময়টা কোথা দিয়ে চলে গিয়েছিল।

'নিয়তি' নামক অদৃশ্য এক নিষ্ঠুরা বোধহয় তখন অলক্ষ্যে বসে হাসছিল। আগে এলে আমি হয়তো ডাক্তার ডাকতে পারতাম। নিয়তিকেই যদি মানতে হয়, তবে মৃত্যুকে অবশ্য এড়ানো যায় না। কিন্তু আমার মার মনের অপরিসীম আপশোসটা? সেটা তো এড়ানো যেত?

মুখ রাখবার জন্যে আমার মার কাছে মিথ্যে করে বলতে হয়েছে, রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে তার জন্যে। জানি না মা বিশ্বাস করেছে কিনা। আজীবন দেখেছি মা সত্যিটা আর মিথ্যেটা খুব বুঝতে পারে। তবু ওই মিথ্যেটা ছাড়া মুখ দেখাবার ত পথ ছিল না আমার, তাছাড়া এও ভেবেছিলাম, যদি এই মিথ্যেটা থেকেও মা একটু সান্ত্বনা পায়। অমিতা আমায় বলেছিল, ফ্ল্যাটটা যে অকস্মাৎ কোনো ভাবে জুটে গিয়েছে তার একটা গল্প বলতে হবে। কেউ শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিয়েছিল, অথবা লটারীতে নাম উঠে পড়েছিল, একটা কিছু। তারপর বলে ফেলতে হবে পত্রিকায় নাকি এমাসে আর শুভদিন নেই, তাই চটপট গৃহ-

প্রবেশটা করে নিতে হবে। আর মা বাবাকে একটা দিনের জন্য অন্তত নতুন বাড়ির অসুবিধের মধ্যেই থাকতে হবে। রাত কাটানোই নাকি নিয়ম।

অবোধের যে ভঙ্গীতে বলতে হবে এসব, সেটা অমিতা নিপুণভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল। তবু মনোজ ভয়ানক একটা অস্বস্তির ভারে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি আসছিল।

আচ্ছা, মনোজের কি হঠাৎ মনে হয়েছিল, কোথায় যেন কী একটা হালকা হয়ে গেল!

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও মনে হয়েছিল, কী যেন একটা ভার নেমে গেল। তার মানে মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের বেশী তফাৎ নেই।

পিসতুতো দাদা কমলেশ পিছন থেকে আস্তে ডাকল, মনোজ, আয় চানটা সেরে নে। কমলেশের গলায় স্বরটাই যেন সান্ত্বনার আর ভালোবাসার। উঠে দাঁড়াল মনোজ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল অনেক চেনা মুখের সারি। এরা সবাই এসেছিল মনোজের দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

মনোজ কখনো এমন সহৃদয়তা করেছে কারো সঙ্গে এমন মনে পড়ল না। যা কিছু দায় দৈব সামাজিকতা, সব ব্যাপারে বাবাই ছিলেন ভরসা। বাবাই যোগাযোগ রাখতেন সকলের সঙ্গে।

হঠাৎ ভারী আশ্চর্য লাগল মনোজের, এরা সবাই ছিল? কিন্তু মনোজ কোথায় ছিল। এরা তার 'নিকট আত্মীয়।' ছেলেবেলা থেকে অনেকটা বয়েস পর্যন্তই এদের সঙ্গে ছিল খেলাধুলো মেলামেশা। কমলেশদার সঙ্গে তো কত সময় একখানেই থেকেছে। কমবয়েসে তো ছেলেরা মামারবাড়ি এসে থাকে-টাকে। কমলেশও থাকতো।

আচ্ছা কতদিন কমলেশের সঙ্গে দেখা হয়নি মনোজের। নামটাই ভুলে গিয়েছিল যেন।

আমি আমার শৈশব বাল্য কৈশোর সবাইকে ভুলে গেছি, তারা যেন হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। আমি শুধু আমার যৌবনের মধ্যেই নিমজ্জিত। যেখানে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রথম সূর্যের দীপ্তি আর উত্তাপ নিয়ে বিরাজ করছে অমিতা নামের এক অমিত শক্তিময়ী। যে মেয়ে মনোজের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণটা নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছে এবং পেয়েছে। অথচ একদিন এরা সব আমার খুব পরিচিত, খুব বন্ধু ছিল। এখন শুধু একটা ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতি। তাও দেখলাম বলে।

মনোজ দেখল, এরা সকলেই স্নানের জন্যে প্রস্তুত। মনোজের মনে পড়ল বেরোবার আগে এক ফাঁকে অমিতা বলেছিল, 'গঙ্গায়-কঙ্গায় ডুব দিতে যেও না যেন।'

মনোজ বোকার মত বলল, কোথায় চান করা হবে ?

কমলেশ হেসে উঠল।

আশ্চর্য, কমলেশ অনায়াসেই হেসে উঠতে পারল এই পরিস্থিতিতে। হেসে বলল, এই যে সম্মুখে প্রবাহিত পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! বাড়ি গিয়ে, আর একবার চান না করলে যাঁর মাহাত্ম্যটি গা থেকে চেঁচে তোলা যাবে না।

চান করে অনেকেই যে যার আস্তানায় চলে গেল। শুধু কমলেশ রইল সঙ্গে। হঠাৎ বলে উঠল, মামা যে এ ভাবে হঠাৎ চলে যাবে ভাবতেই পারি নি। এই গত সপ্তাহেই দেখেছি, কিছু টের পাওয়া যায় নি।

মনোজ ভাবল, গত সপ্তাহে? কোথায় দেখেছিল কমলেশ মামাকে? মামার বাড়িতে না কি ?

এরা তাহলে এখনো আসে ? মনোজ জানতে পারে না। ইদানীং অনেক দিন আর মা বাবার সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আচ্ছা, মাও তো কই আর ডেকে বলত না, জানিস খোকা, আজ অমুক এসেছিল। জানিস খোকা আজ এই হয়েছিল।

কিন্তু কখন বলবে ? কখন মা তার খোকাকে পেত ?

বাবা মায়ের কাছে বসে একটু কথা কইলেই যেন ওই 'খোকা' নামের লোকটার কী যে একটা অস্বস্তি হতে থাকে। অজানিত একটা অপরাধ বোধ, অকারণ একটা পিছু-টান, কোথায় যেন কী একটা কসুর হয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের অস্বস্তি। শুধু মা বাবাই বা কেন ? অমিতার অনুপস্থিতিতে যে কারো সঙ্গে কথা বললেও। কেন এমন হয় মনোজ জানে না।

অমিতার সেই বঙ্কিম ওষ্ঠের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ঝিলিক মারা হাসিটুকুই কি এই অস্বস্তির জনক ?

'সহজ' হবার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে কমলেশের। অনেক খানিকটা প্রাণশক্তি না থাকলে বোধ করি এমন 'সহজ' হওয়া যায় না।

ট্যাক্সিতে চেপেই বলে উঠল, গাড়িটা ঘুরিয়ে একবার বাড়িতে বলে যাই।

কাছেই বাড়ি কালীঘাটেই।

গাড়ি থেকে নামতে হলো না কমলেশকে, দরজার কাছে পৌঁছেই দেখল কমলেশের বৌ ছেলেকে নিয়ে তার স্কুল থেকে ফিরছে। এখন, ছেলের বইয়ের বোঝা তার

মার কাঁধে ঝুলছে।

কমলেশ বলল, ছাখ একবার মাতৃস্নেহের ঘটা। ছেলেকে যে খেটে পিটে 'করে খেতে' হবে তা খেয়াল করছে না।

বলেই বলল, তোকে আর বলছি কি। তোকেও তো মামা এই ভাবে পুতুপুতু করে মানুষ করেছিল।

বৌ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কমলেশ গাড়ি থেকেই মুখ বাড়িয়ে বলল, খবরটা দিয়ে যেতে এলাম, এখন মামার ওখানেই চলে যাচ্ছি—না না ভয় খেওনা, মামার 'বর্তমান বাসায় নয়, পরিত্যক্ত বাসায়। মামার জন্যে ভাগ্নেরও একটু অশৌচ লাগে, ওখানেই থেকে যাব। দুদিন পর ফিরব। তোমার হাতে পড়লে তো, খাওয়া জুটবে না। 'ভাতে ভাত' মানে হয়তো আধখানা কাঁচকলা ভাতে, আর ফল মানে, একফালি শুকনো শশা আর একটা বুড়ো আঙুল সাইজের কলা ব্যস। কী গো এর বেশী আশা আছে?

মনোজ না বলে পারে না, আঃ কমলেশদা, কী হচ্ছে?

কমলেশের বৌ অম্লান গলায় বলল, তোমরাই ছাখো ভাই, সারাদিন কী হয়। তোমাদের এই দাদাটিকে দেখলে মনে হয় বৌ খেতে দেয় না।

কমলেশ তার পুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহটির দিকে 'অপাঙ্গে একটি দৃষ্টিপাত করে বলে এ হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি। আচ্ছা, ওই কথাই থাকল। সাবধানে থেকো। এই রাতুল, মাকে নজরে রাখবি। যেন এই ফাঁকে পৃথিবীর যত কাজ টেনে টেনে বার করে ঘাঁটে না। পূর্বজন্মে তো ঝাড়ুদারনী ছিল, সুযোগ পেলেই ঝাড়ু ধরবে।

আচ্ছা টা টা। মুখটা ঢুকিয়ে নিল গাড়ির মধ্যে!

মনোজ একটু পরে বলল, তুমি এইভাবে কথা বল, বৌদি রাগ করে না?

করলে ভাতের চাল চারটি বেশী নেবে। সবইতো নিজের হাতে। আমরা হতভাগা তো ওনাদের হাত তোলাতে পড়ে থাকি।

হেসে উঠল জোরে।

একজন সন্থ পিতৃহারার সামনে, (মৃত ব্যক্তি তার নিজেরও নিকটাত্মীয় ছিল) এভাবে হাসাটা যে অনুচিত এ কথা মনেও আসে না। অথচ আশ্চর্য, হৃদয়হীন বলেও তো মনে হচ্ছে না কমলেশকে।

তুই একটা ফ্ল্যাট কিনেছিস না সল্ট-লেকে?

নাঃ, এতো চেষ্টা, এতো লুকোছাপা, তবু অবাক হয়ে দেখছে মনোজ কারুরই ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই।

মনোজ ক্ষীণ গলায় বলল, পেয়ে গেছি একটা।

লাকীম্যান।

বলল কমলেশ, একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাওয়া তো ভগবান পাওয়াতুল্য। লাখ দুলাখ গুণে দিয়েও যেন ভিক্ষে পেয়ে বর্তে গেলাম। শুনে অবধি তো তোর বৌদি আমায় খেয়ে ফেলছে।

মনোজ ক্ষীণ স্বরে বলল, তোমায় কে বলল ?

খবর বাতাসে ভাসে। তোর ফ্ল্যাটের পাশেই যে এনার মাসতুতো বোনের ফ্ল্যাট ! মজুমদার। দেখিস গায়ে পড়ে ভাব করতে আসবে। দুবেলা আসবে। জীবন মহানিশা করে ছাড়বে। তো সংবাদদাত্রী সেই মাসতুতো বোন, শুনে অবধি আমায় উঠতে বসতে গঞ্জনা। বলে, মনোজ তোমার ছোট, মা বাপ থাকতে এমন একখানা হিম্মত দেখাতে পারল, আর তুমি নাকে তেল দিয়ে বসে আছো। তোমার তো কেউ কিছু খোঁটা দেবার নেই। হিংসেয় জ্বলছে, বুঝলি ? মেয়ে মানুষের স্বভাব-ধর্মই ওই। ওরটি কেন ভালো হলো আমার কেন হলো না। আমি তো বলি হা হা হা, বলি যে অন্য মেয়ের ভালো বর দেখল কত বুকই ফাটে তোমাদের। তো বায়না তো করা যায় না, আমার ওই রকম বর চাই ! দে, শালা অন্তত জোগাড় করে। ওর মতন বাড়ি গাড়ি।

আঃ। কমলেশদা, এই সব বল তুমি ?

—বলব না কেন ? সত্যি কথা বলবার সৎসাহস থাকবে না পুরুষ বাচ্চার ? ওরে ওদের গঞ্জনাকে কেয়ার করতে শুরু করলে রক্ষে আছে ! সে তো সমুদ্রে কূল পাবার চেষ্টা ! আমার ওই কালীঘাটের বাড়িটায় এখনো ৬০ টাকায় ভাড়া আছি ভাবতে পারিস ? অবিশ্যি বাবার আমল থেকেই থাকা। আগে পঁয়তাল্লিশ ছিল, বেড়ে-ফেড়ে ষাট দাঁড়িয়েছে। দোতালা বাড়ি, ওপর নীচে চারখানা ঘর, দালান রান্নাঘর, বাথরুম। রান্নাঘরের সাইজই তো এ যুগের লাখ টাকার ফ্ল্যাটের বেড্‌রুমের থেকেও বড়। বাড়িওলা ব্যাটা তো বোধহয় দুবেলা শাপমুন্যি দিচ্ছে। আমি উঠে গেলে ওই বাড়িই সাত আট শো টাকায় তুলবে। বাদে মোটা সেলামী ! তাহলেই বোঝ ? …তা' তোদের ওই বাড়িটার জন্যে তো বাড়িওলা বুড়ো নির্ঘাৎ ওৎ পেতে বসছে। যেই ছাড়বি সেই লুফে নেবে। ও বাড়ি তো এখনো হাজার বারোশোর কম নয়।

আমাদের বাড়িটা !…আড়ষ্ট হয়ে তাকায় মনোজ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে গাড়ি। কমলেশের দ্রুতভাষীত্ব এখন আরো দ্রুত।

হ্যাঁ তোদের ওই বাড়িটা তো ছাড়তেই হবে ! মামীকে একা রেখে তো আর ড্যাংডেঙিয়ে চলে যেতে পারবি না তুই। মামা যে এত শিগগির চলে যাবে, কে

ভেবেছিল। একটা মস্ত প্রবলেম হয়ে গেল তোর। এখানে পুরানো আস্তানায় দুই বুড়োবুড়ি থাকতো, নতুন পাখীরা নতুন ডালে গিয়ে বসতো। দু'পক্ষই সুখে স্বাধীনে থাকতো। তো কুচক্কুরে ভগবান ব্যাটা তো কারুর স্বস্তি সইতে পারে না।

গাড়িটা মনোজদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

কমলেশ বলল, জলভর্তি ঘটটা তোর হাতে আছে তো? অবু মামাকে পুড়িয়ে এলাম অ্যাঁ? মামীর সামনে যে কী করে—

খুব প্র্যাকটিক্যাল কমলেশ ঘাড়টা ঘুরিয়ে মুখ আড়াল করে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

শিশুর মনোজগৎটা বিচিত্র বৈকি। মনে ভাবা গিয়েছিল সেই ধরে বেঁধে আনা তাতাই হয়তো এ বাড়ি এসে দাদুর মৃতদেহ দেখে গড়াগড়ি খেয়ে চেঁচাবে। সে রকম কিছুই করল না সে। নেহাৎ বাচ্চাদের মতো মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে, নিষ্পলকে দেখতে লাগলো মৃতের সাজসজ্জা।

একবার শুধু বলে উঠল, ফুলের মালা পরেছে। বর না কি? কারুর কানে গেল কারুর গেল না। যার কানে গেল, সে চোখ মুছল। লোকের তো অভাব থাকে না এ সময়। লোকে লোকারণ্য।

খাট তোলার আগে কোনো এক পাকা মহিলা বলে উঠলে, দাদুকে প্রণাম করো তাতাই।

তাতাই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'মরে গেছে আবার প্রণাম।' বলে বোঁ করে ছুটে পালিয়ে গেল।

কে একজন বলল, বৌমা ত্যাখো ত্যাখো। কোথায় আবার ছুট মারল। আত্মীয়জনের অনেকেরই প্রত্যাশা, ওই শিশুটা একটা বাড়াবাড়ি কিছু করুক। কান্নাকাটি, খেতে না চাওয়া, অথবা দাদুর ঘরেই পড়ে থাকা! যাহোক কিছু লক্ষ্যণীয় কিছু। যেন তাতেই সন্ত পরলোকগত আত্মা পরম শান্তি পাবে!

কিন্তু শিশুর মতো নির্মম আর কে আছে? শিশুর মত বেইমান?

বললেন, এসব কথা বিজ্ঞরা। আড়ালে আড়ালে।

তা বলবেই না বা কেন? 'শিশু' বলে কি সংসারী ঝুনোদের কাছে রেয়াৎ পাবে? শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা মতিগতির নিয়ামক কে? আমড়া গাছে তো আর ন্যাংড়া ফলবে না?

এই যে নাতির জন্যে 'দাদুভাই' বলে প্রাণটা বার করতো মানুষটা, একবার তার নাম মুখে আনছে না? তাও না পারুক, সেই ঘরটার একবারও ছায়া মাড়াচ্ছে না গো!

শুধু কি তাই ? 'দিদার কাছে একটু বসবে চলো' বলে ডাকলে তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাবে। ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দিদার কোলের কাছে নিয়ে বসালে ছিটকে পালিয়ে আসবে 'দিদাকে বিচ্ছিরী লাগছে' বলে ! তো এই অমানবিক মনোভাবের উৎসমূল কী ?
শুধু যে অমিতারই মা তা তো নয় ? মনোজেরও আছে। একজন নয় জনাতিন।

এই অনিয়মের বাড়িতে তাতাইটার যে কী দুরবস্থা হচ্ছে !
অমিতা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি একটা শক্ত রোগে পড়ে যাবে ছেলেটা।
মনোজ হতাশভাবে তাকাল। এ ক্ষেত্রে কী জবাব দেওয়া যায় ভেবে পেল না।
অমিতা ক্ষুব্ধ গলায় বলল, এইটুকু বাচ্চা, ওকেও শাস্ত্রীয় আচার মেনে নিরামিষ খেতে হচ্ছে। মাথায় তেল দিতে পারছে না। রেখা ছন্দা শাশ্বতী সেদিন টেলিফোনে শুনে আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'ভাবা যায় না।'
কমলেশের সংগে মিশে মিশে মনোজেরও কি কোথাও একটু দুঃসাহস সঞ্চিত হয়ে গেছে ? তাই বলে ফেলে, কত সম্প্রদায়ের মধ্যে তো নিরামিষ খাওয়ারই চল। তাদের বাচ্চারা কী—
চমৎকার! একটা বোকাটে প্রেজুডিসের ভয়ে তো বেশ বুদ্ধিমানের মতো যুক্তি খাড়া করতে শিখে ফেলেছ ? 'হ্যাবিট' বলে একটা কথা আছে জানো সেটা ? জানো হয়তো, কিন্তু মানো না। আমি তো ভেবেছিলাম ওকে ও বাড়িতে মার কাছে পাঠিয়ে দেব। বাপী তো প্রায় রোজই আসছে। তো ওই বিচ্ছু ছেলে, কিছুতে গেল ? একেবারে একটা ইস্পাত ! অতিরিক্ত আদর আর প্রশ্রয়েই এমনটি হয়ে বসেছে, সাধে আমি 'ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট' করিনি। চোখ চেয়ে দেখছি, ছেলেটা বিগড়ে যাচ্ছে অথচ করার কিছু নেই। এ যে কী অবস্থা। ভেবেছি হোক আমার নিন্দে, ছেলের ভবিষ্যৎ আগে।
একবার থেমে ঠোঁট কামড়ে বলে, অবশ্য নিন্দের যে কী আছে, সেটাও অবোধ্য ! সভ্য জগতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গুহামুখো হয়ে দাঁড়ালে অবশ্য আলাদা কথা। তোমাদের আত্মীয়গুষ্ঠির পায়ে নমস্কার ! একটা মৃত্যু উপলক্ষে বাড়িতে যেন বিয়ে বাড়ির সমারোহ। তোমার ওই মাসি পিসি খুড়ি জেঠিরা এখানে এসে বসে থেকে ভাবছেন যেন কতই উপকার করছেন।
মনোজ ভয়ে ভয়ে বলল, তো আমরাও তো সত্যি কিছু জানিও না।

জানবার এতো কী আছে তাও জানি না। এসব ব্যাপারে সবই তো পুরুত-টুরুত বলে দেয়। তা তোমাদের ওই মেজ জ্যেঠি না কে? তিনি আবার তখন কাকে যেন বলছেন শুনলুম 'লোক'ই 'শোকের' ওষুধ! কথার বাঁধুনী ভাবো? ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলি, 'লোকই রোগের স্রষ্টিকর্তা।' উঃ রাতদিন এই লোকারণ্যর মধ্যে থেকে সারাক্ষণ মাথা ঝিমঝিম করছে। আশ্চর্য! এতো আত্মীয় তোমাদের। হরদম আসছেই আসছেই শোকে সান্ত্বনা দিতে। যাই বলো—এ হিসেবে তোমার মা বাবা নমস্য ব্যক্তি। জীবনের প্রারম্ভ থেকে, এ যাবৎকাল পর্যন্ত যত আত্মীয়-জনেরা, শাখায় প্রশাখায় তো বেড়েই চলেছে, সব্বাইকে বুকে ধরে বসে আছেন। সবাই নিতান্ত 'আপন জন।' ভাবা যায় না।

অমিতা চলে যায় 'ভাবা যায় না' বলে। কিন্তু মনোজ ভাবতে থাকে। ভেবে অবাক হতে থাকে। সত্যি, এতো আপনজনকে বুকে ধরে রাখবার এই অসীম ক্ষমতা কোথায় পেয়েছিলেন এই অতি সাধারণ মানুষ দুটি? তুতো থেকে তুতোর তুতোয় পৌঁছেছে তাঁদের আপনজনের পরিধি। জ্যেঠামশাইয়ের শালাও না কি মনোজের মামা।'

আচ্ছা এই বিশাল পরিধিটাকে যোগসূত্রে বেঁধে রেখে এসেছেন কোন্ মন্ত্রবলে? তা' মন্ত্রবলই বলতে হবে বৈকি। অর্থবল তো ছিল না এমন কিছু! ছিল না বিশেষ কোনো ক্ষমতার বলও। যাতে লোককে কাছে টেনে রাখা যেতে পারে।

শুধু ভালবাসা? শুধু আন্তরিকতা?

অন্তরটা কতো বড় হলে এতোটা আন্তরিকতার সঞ্চয় জায়গা পায়?

ক'তজন যে আসছে মনোজকে তার পিতৃবিয়োগে সান্ত্বনা দিতে। কে তারা সবাইকে বুঝতেই পারে না মনোজ। আর ভাবে মা বাবা এতো জনকে জেনে চিনে মজুত রেখে এসেছেন!

তবু এরা যতক্ষণ আছে, মনোজ একটা তাড়া করে আসা আতঙ্কের হাত থেকে বেঁচে রয়েছে। এরা সরে গেলেই সেই আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সেই আতঙ্ক 'চারুলতা'।

পিতৃদায় জানাতে সব বাড়ি যেতে হয়। শ্বশুরবাড়িতে অমিতার মা বললেন, অবশ্যই। এখানে আর পারের কাণ্ডারী কমলেশকে আসতে হয় নি, যে নাকি সর্বত্র নয়ে নিয়ে যাবে মনোজকে। মনোজ আর ক' জনের বাড়ি চেনে?

এখানে সঙ্গী মনোজের সংসার তরণীর চিরকাণ্ডারী।

শাশুড়ী বললেন, একদম খালি পা? তোমাদের বাড়িতে বাবা সবেতেই বাড়াবাড়ি।

রবারের চটি তো আজকাল সবাই পরে! তা' যাক, দিন তো কেটেই এল। শুনলাম প্রায় রাজসূয় যজ্ঞ ফেঁদেছ?

শ্বশুর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, কী করবে? ওদের যে অনেক আত্মীয়। এতো আছে জানতাম না।

মহিলা একটু হাসলেন, আত্মীয়জনের সংখ্যার লিমিট না থাকতে পারে, ক্ষমতার তো একটা লিমিট আছে?

আহা সে ওরা বুঝবে। জনবল যথেষ্ট। ওই ওর পিসতুতো দাদা কমলেশ না কে, একটা ছেলে দশটা মানুষের খাটুনি খাটছে।

ঘরে ঘরভেদী থাকলে আর কী করা? এই মানুষটির উপস্থিতি বড় অসুবিধে-জনক অমিতার মার।

তবু কাজের কথা তো পাড়তেই হবে।

তোমার মায়ের কী ব্যবস্থা করছ?

আবার সেই অসুবিধে। কর্তার উক্তি, আহা ব্যবস্থা আবার কী? মা তো ওদের সঙ্গেই থাকবেন।

অমিতার মা এতে অবিচলিত থাকতে পারেন না। বলে ওঠেন, তুমি তো বলে দিলে একটা কথা। বেয়ানের আমাদের কত রকম বিদঘুটে 'হ্যাবিট' আছে জানো তুমি?

কী আশ্চর্য। উনি কি তাহলে একা থাকবেন?

তা কেন?

'থাকে ফাঁড়া খণ্ডে যাক—' গৃহিনী বলে ওঠেন আজকাল অনেক জায়গায় যথেষ্ট রেস্‌পেকটবল্ 'হোম' হয়েছে। এই রকম সব একা হয়ে যাওয়া মানুষদের জন্যে। টি. ভি. তে দেখিয়েছে, অতি সুন্দর বাড়ি। ব্যবস্থাও—

অমিতার বাপী হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, হয়েছে না কি? যাক জেনে নিলাম, এখন যমরাজ এসে দাঁড়ালে ভয় পাব না। নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারব, 'চলুন স্যার।' মিতু মা তুমিও তাহলে ক্লীয়ার? বাপ ব্যাটা মরলে, 'মার কী হবে', ভাবতে হবে না। হা হা!

'আয় একটু চা খেয়ে যা'···বলে মেয়েকে অন্তরালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত মহিলাটি বিবর্ণমুখে গলা খাদে নামিয়ে বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? বলিনি তোকে আমি? ঠাকুর-ঠুকুর মাদুলী কবচ তুকতাক, অনেক কিছু জানে তোর শাশুড়ী; করেছে কিছু। এই মানুষের আগে ওদিকে এতো চল্ ছিলো? জানি না তোর কপালে কী আছে। এখন নাতিটিকে হাতে পেয়ে কী

করছেন কে জানে? হয়তো তাকে ফুসলোচ্ছেন।

কিন্তু মহিলার আশঙ্কা তো নেহাৎই অমূলক। নাতি তো তারস্বরে ঘোষণা করছে, না দিদা, নতুন বাড়িতে যাবে না। দিদা এইখানেই থাকবে।

কেন?

আমার ইচ্ছে।

হায়। এই কি তুকতাকের ফলশ্রুতি?

দোহাই তাতাই, বাড়ি গিয়ে যেন দিদার কাছে বোলো না একথা।

বাপের মিনতি বাণীতে একটু কর্ণপাত করেই অমোঘ উত্তর দেয় তাতাই, আমার ইচ্ছে হলে বলব, না ইচ্ছে হলে বলব না।

যথাদিনে, 'রাজসূয় যজ্ঞ' সমাপ্ত হয়। বানের জলের মতো ফুলে ফেঁপে যে স্রোত এসে পড়েছিল, তা বানের জলের মতোই সরে গেল।

অতঃপর সেই পুরনো সদস্য কটি? ইস্। তাই কি?

বিশাল একটা ফাঁক নেই তার মধ্যে? যেটা একটা গহ্বরের মত হাঁ করে ভয় দেখাচ্ছে। চারুলতা নামের একদম বদলে যাওয়া চেহারার মানুষটা কি তখন ওই গহ্বরটার পরিমাপ করবার সময় পেয়েছেন? পান নি তাই এখন একটা স্তব্ধতার জগতে ঢুকে পড়ে, সেটা মেপে চলেছেন।

ভেবে চলেছেন এতদিনের একান্ত আশ্রয়স্থল, এই সংসারটা হঠাৎ এমন অর্থহীন হয়ে গেল কী করে?

সংসারের চিরপরিচিত উপকরণগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে যান চারুলতা। এই অর্থহীন বস্তুপুঞ্জকে জীবন ভোর তিনি পরম মূল্যবান ভেবে এসে-ছেন?

এই হাঁড়ি কড়া বঁটি কাটারি শিল নোড়া চাকি বেলুন! এই একে একে কিনে জমিয়ে তোলা স্টেনলেসস্টিলের বাসনের গাদা, ভাঁড়ারের তাকের পুরনো শিশি কৌটো বাতিল করে করে, ছোট বড় মেজ সেজ নানা মাপের পলিথিনের কৌটোয় সাজিয়ে রাখা জিরে পাঁচফোড়ন হলুদ কালোজিরে। এগুলো চারুলতার একান্ত ভালবাসার বস্তু ছিল। কোথায় চলে গেল সেই ভালবাসা, সেই মূল্যবোধ? এখন গীতার মা ওগুলো চেয়ে বসলে, অনায়াসেই বলতে পারেন, নিয়ে যা! আমি আর এসব নিয়ে কী করব?

আচ্ছা এতো অবকাশই বা কী করে এল এখন চারুলতার জীবনে? কোথায় সঞ্চিত ছিল এই অবকাশের দুর্বহ বোঝা? সেই কোন্ কালে এ সংসারে এসেছিলেন

চারুলতা। তদবধিই তো ঘাড়ে মাথায় কাঁধে পিঠে, শুধুই কাজের বোঝা। কিন্তু সে বোঝা কি এতো দুর্বহ ছিল?

কাজ মানেই তো আহ্লাদের, আনন্দের, ভালবাসার।

সংসারে কত পট পরিবর্তন হলো, কত জন বিদায় নিল এ সংসার থেকে। শ্বশুর, শাশুড়ী, বিধবা ননদ। অতঃপর কেবলমাত্র একটি সন্তান নিয়ে দুটি মানুষের যেন গাঁটছড়া বাঁধা জীবন।

এই খানটায় চোখ ফেলে যেন থমকে থেমে যান চারুলতা! কী ঔজ্জ্বল্য কত আলো। জীবনের এই অধ্যায়টুকু বুঝি সোনার জলে লেখা। খোকা বড় হয়ে উঠছে, লেখা-পড়ায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর। চটপট কৃতী হয়ে ওঠা। দিন যেন পালকের মতো হালকা। গানের সুরের মতো আবেশময়।

কিন্তু সে দিনগুলো হঠাৎই কোথা দিয়ে যেন চলে গেল। বড় তাড়াতাড়ি। সংসারে হল আর এক নতুন পট পরিবর্তন।

মেয়ের বিয়ে দিতে 'কন্যাদান' 'কন্যা সম্প্রদান' শব্দগুলি প্রচলিত, কিন্তু ছেলের বিয়ে দিতে? না, এমন কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় নেই।...এটার ভূমিকা নিঃশব্দের, তবে একই টাকার এপিঠ ওপিঠ।

অথচ সমাজের টেবিলে শুধু একটা পিঠই চিৎকরা পড়ে থাকে। কন্যাদান। 'কন্যা সম্প্রদান।'

না, সমাজে পুত্রের সম্পর্কে এরকম কোনো শব্দ চালু নেই।

কিন্তু কেন নেই?

থাকা উচিত ছিল। থাকা দরকার ছিল। তাহলেই তো পুত্রের জন্মমুহূর্তটি থেকেই মনের মধ্যে চলতো প্রস্তুতির কাজ। এটি আমার নিজের জন্যে নয়, অন্য কেউ একজনের জন্যে। যেমন কন্যাসন্তানের বেলা।

এদের তৈরী করে তোলা আমার কাজ। তৈরী করা, কৃতী করা! যাকে যত কৃতী করে তুলতে পারবে তার 'মালিক' পায়ের তলায় ততো শক্তমাটি পাবে। ততো শক্তি সঞ্চিত হবে তার।

কিন্তু আমাদের সমাজ একটা কাল্পনিক স্বর্গ গড়ে রেখে, একটি মূঢ় আশায় কন্যা আর পুত্রের মধ্যে ব্যবস্থা রেখেছে।

পুত্র সন্তান 'আমার জন্যে' আমার বংশধারা রক্ষার জন্যে, আমার পরলোকবাসী (যদি থাকে সেই পরলোক) পিতৃপুরুষের জন্যে!

কী মূঢ় প্রত্যাশা!

এই মূঢ় প্রত্যাশার জন্যই না, অহরহ অন্তরের অন্তরালে চলছে নিঃশব্দ ব্যবচ্ছেদ।

অদৃশ্য রক্তক্ষরণ !

চারুলতা বিদূষী নয়, চারুলতার চিন্তা ভাবনার জগতে কিছু আর প্রগতিশীল চিন্তার প্রশ্ন থাকার কথা নয়। নেহাৎই সাদামাঠা সেই জগৎ, তবু চারুলতা মাঝে মাঝে ভাবেন, সমাজব্যবস্থা যদি পুত্রের সম্পর্কে ওই রকম একটা কিছু থাকতো, বোধ হয় ভালো হতো, প্রস্তুতি থাকতো মনের মধ্যে।

তাহলে আর এমন ভিতরে ভিতরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটত না। চলত না লড়ালড়ি আর কাড়াকাড়ির নির্লজ্জ প্রকাশ !

অথবা হ্যাংলামি আর কাঙালিপনা !

অবিনাশ অবশ্য চারুলতার মতো এমন প্রগতিশীল চিন্তার ধার ধারতেন না, চারুলতা এ ধরনের কথা বললে রেগে যেতেন। বলতেন, চমৎকার। তুমিও যে দেখছি চিন্তা ভাবনায় বেশ আধুনিকা হয়ে উঠছ। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ে পড়ে বুঝি ? ছেলের কাছে প্রত্যাশা থাকবে না? তবে কার কাছে প্রত্যাশা থাকবে শুনি ? সারাজীবন তো ভুতো খাটুনী খেটে মরা, জীবনের শেষের দিকে ছেলে বৌ নাতি-নাতনী নিয়ে সংসার করাটাই তো, জীবনের সার্থকতা। এই দিনটির আশাতেই তো দিন গোণা। হঠাৎ ভাবতে বসবো, এ আশা ভুল। এ ইচ্ছে হ্যাংলামি ! কেন ? আবহমান কাল ধরে কী চলে আসছে ?

চলে আসছে বলেই কি চিরকাল চলবে গো ?

চারুলতা হেসে ওড়াতে চাইতেন। কিন্তু অবিনাশ উষ্ণ হতেন। বলতেন, কেন, সেই চলে আসার মধ্যে কী এতো দুঃখুটা ছিল শুনি ? আমাদেরও কি একটা বয়েস-কাল ছিল না ? গুরুজনকে মান্য ভক্তি, বাধ্যতা, নম্রতা, কর্তব্য দায়িত্ব, সভ্যতা ভব্যতা, সবকিছু মেনে মেনেই তো চলে এসেছি। আমরা খুব দুঃখী ছিলাম ? কত সুখ, কত আনন্দ, কত শান্তিতে কাটিয়েছি, ভাবো তো সেই সব দিনের কথা ?

চারুলতা বলতেন, আমাদের আমলের কথা বাদ দাও !

অবিনাশ আরো রেগে উঠতেন।

চিরকালের সদা সন্তোষ সাদা প্রসন্ন শান্ত স্বভাবের মানুষটা, রাগ কাকে বলে জানতেন না। অথচ ইদানীং প্রায় প্রায়ই রেগে উঠতেন। রেগে বলতেন, কেন, বাদ দেব কেন ? ওই বাদ দিয়ে দিয়েই তো ক্রমশঃ সব বাদ চলে যাচ্ছে ! সভ্যতা ভব্যতা, নম্রতা চক্ষুলজ্জা, রীতিনীতি আচার নিয়ম, সব বাদ ! গুরুজনকে মান্য করা মানে নিজের অপমান। ছি ছি। ঝাড়ু মারো তোমাদের এ যুগের মুখে। কিছু না থাকুক, একটু ভালবাসা থাকতে নেই ? একটু উদারতা থাকতে নেই ?···কিন্তু এই তোমাদের

এযুগই কি এতে খুব সুখে শান্তিতে আছে? তা হলেও তো বুঝতাম। সর্বদাই তো ব্যাজার বিরক্ত, আর অসন্তোষ, অপ্রসন্নতা!

তা' চারুলতাও এই প্রশ্নের ধাঁধায় থাকেন। সত্যি, 'আহ্লাদ' জিনিসটা এরা কোথায় হারিয়ে ফেলেছে? হয়, সাময়িক "হি হি" আছে, নয়, বিরক্তি, বেজার!

আচ্ছা আমাদের কী এতো ছিল? সবসময় অকারণ একটা আহ্লাদের মধ্যে থাকতাম কী জন্যে?

ভাবেন এসব চারুলতা অনেক। কিন্তু অবিনাশ যখন এ আক্ষেপ করেন, তখন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

কিন্তু কেন? কেন চারুলতা কেবলই তাঁকে থামাতে চেষ্টা করতেন?

কেন চারুলতা অবিনাশকে বুঝতে দেন নি আমিও তোমার মতোই এই মনোব্যথায় ভুগি গো। আমিও তোমার মতোই ভাবি; ভালবাসার মতো বড় জিনিস না হোক সামান্য একটু সৌজন্য, সামান্য একটু উদারতা, এটুকু কি দেওয়া যায় না? মান্য করবে এমন প্রত্যাশা করি না অকারণ, অহেতুক তেড়ে এসে অপমান করারই কি খুব দরকার তোমাদের এ যুগের?

তবে সবচেয়ে কষ্ট হতো চারুলতার খোকার দুরবস্থায়! ওর ভেতরের দুঃখও কি বুঝতেন না? ওর নিরুপায়তা, আর হতাশ আত্মসমর্পণ, বুঝতে পারতেন না কি চারুলতা? কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পেতেন চারুলতা। মনে করতেন আগুনের ফুলকিকে বাতাস না দিয়ে, জল দেওয়াই বুদ্ধির কাজ।

নিজেকে সেই মানুষটার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করতেন চারুলতা। অথচ আজ? আজ সেই মানুষটার অভাবে, চারুলতা যেন আপন অস্তিত্বটাকেই খুঁজে পাচ্ছেন না।

এই তিনিই কি সেই চারুলতা?

বিশ্বাসে আসে না, অনুভূতিতে আসে না। মনে হয় সে আর কেউ।

এখন একবারের জন্যে যদি সেই কিছুটা বোধহীন, ভিতরের অনুভূতি প্রকাশ করে ফেলা, নেহাৎ সাধারণ মানুষটাকে দেখতে পেতেন চারুলতা! এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিতেন।

কিন্তু একেবারেই কি বোধের জগৎ অনুভূতির গভীরতা ছিল না অবিনাশ নামের অতি সাধারণ মানুষটার? তাহলে কী করে সেদিন, হ্যাঁ বোধহয় মারা যাবার কটা দিন আগে, হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা চারু, ধরো তুমি খুব যত্ন করে একটি

গোলাপ গাছে সুন্দর একটি গোলাপ ফুটিয়েছ, সেই ফুলটার ওপর তোমার প্রাণঢালা, তো সেই ফুলটি গাছ থেকে তুলে তুমি একজনকে উপহার দিলে। অ্যা শুনতে পাচ্ছো? উপহার দিলে, আর তক্ষুণি দেখলে, ফুলটাকে নিয়ে সে ছিঁড়ে কুঁচি করল, তারপর মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে থাকল, অথচ তোমার কিছু বলার জো নেই, কেমন লাগে তোমার?

চারুলতা কি বুঝতে পারেন নি, কিসের এই তুলনা! 'খোকা' বলে যে সমস্তটি প্রাণ-ঢালা ছিল তাঁর। কিন্তু চারুলতা কেন এই উক্তিতে একাত্ম হয়ে বলে উঠতে পারেননি, ওগো তুমিও এই রকম ভাবে ভাবো?

চারুলতা না বোঝার ভান করে বলেছিলেন, হঠাৎ এমন কবিত্বে কথা! কবিতা টবিতা লিখছ না কি আজকাল?

অবিনাশ আর কথা বলনেনি। পড়া খবরের কাগজটাই আবার মুখের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

সেই মুহূর্তগুলো আর কোনো মতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না। শুধু মূঢ় কল্পনায় ভাবতে হবে বসে বসে, কোনো একদিন 'সেখানে' দেখা হবে।

নিস্তরঙ্গ নদীতে একটা ঢিল পড়ল।

দিদা, আমার একটা থলি চাই।

তাতাই এসে দাঁড়িয়েছে। যেন বায়ুতাড়িতের মতো। কতদিন পরে যেন 'দিদা' বলে ডাকল তাতাই। ভাবলেন চারুলতা।

মনে পড়ল না। কতদিন ওকে পুরো করে তাকিয়ে দেখেননি চারুলতা। তাও মনে পড়ল না, দেখলেন তাকিয়ে। নিয়মটা নাকি ভঙ্গ হয়ে গেছে। তবু ছেলেটার মাথা এত রুক্ষু কেন?

চুলটা রুক্ষু শুকনো, পা দুটো ধুলোমাখা।

দেখে ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠল।

অথচ দেখেছেন, অন্যের অনুরোধ প্ররোচনা কোনো কিছুই কাজে লাগেনি, তাতাইকে চারুলতার কাছে বসানো যায় নি। অতএব নিজে আর সেই বৃথা চেষ্টা করতে গেলেন না চারুলতা! 'আয় বোস' শব্দটাকে ঠোঁটের আগা থেকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে ফেলে, বললেন, থলি কী হবে রে তাতাই?

স্বভাবগত অসহিষ্ণু স্বরকে অসহিষ্ণুতার উচ্চগ্রামে তুলে, তাতাই বলে উঠল, আছে দরকার! তুমি দাও তো!

কিন্তু থলি! থলিতে ভরে কী যেন সব আনা হতো, রাখা হতো।

কোথায় আছে ? আছে কি এখনো ?

মনে মনে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, চারুলতার আছে, এই ঘরেই আছে।

পুজোর জিনিষ-টিনিষ কিনতে একটি বিশুদ্ধ থলি তোলা ছিল চারুলতার। সুদৃশ্য মজবুত। ফলটল কিনতে যাতে বাঁধনটা না ঢিলে হয়ে যায়।

বেশীদিনের নয় জিনিষটা। মনে হচ্ছে যেন ওই সেদিন, অই মানুষটা থলিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, ও বাবা! বাজারের থলির এতো বাহার!

শুধু বাজারের বলো না, বল পুজোর বাজারের। পুজোর ফল কিনতে দরকার হলে, সেই আগে থেকে বাজারের থলিটা কেচে রাখতে হয়, তাই আলাদাই কিনলাম একটা।

বেশ! বেশ! কিনলে কোথায় ?

মোল্লার দৌড় মসজিদে। কোথায় আবার। এই তোমার সামনের 'লক্ষী স্টোর্সে।'

ও বাবা! ওরা আবার এ সব জিনিষও রাখে ?

কত জিনিষই রাখে। তাকিয়ে ছাখো কিছু ? নেহাৎ আজ রিক্সা থেকে নামার সময় চোখে পড়ল তাই।

আলমারীর পিছনের দেওয়ালে পোঁতা পেরেকে টাঙানো থলিটা পেড়ে এনে নাতির সামনে ধরে বললেন, এতে হবে ?

চোখ দু'টো হঠাৎ উজ্জ্বল দেখালো তাতাইয়ের। ঠোঁটের কোনায় একটু যেন আলোর ঝিলিক্।

ফস করে হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিল।

রংটা ময়লা হয়ে গেছে ছেলেটার, চামড়ার লালিত্যটাও যেন কমে গেছে। অনেক অনিয়ম গেল বাচ্চাটার ওপর দিয়ে। যাক্, এবারে শান্ত স্থিরতার মধ্যে থাকতে পাবে, যত্ন পাবে ঠিক মতো। স্নেহে বুকটা ভরে উঠছে চারুলতার।

সঙ্গে সঙ্গে চোখটাও। তাতাইয়ের 'বড় হয়ে ওঠাটা' 'তিনি' দেখলেন না। কিন্তু চারুলতাই কি দেখতে পারেন ? ইচ্ছেও নেই।

আবার অবকাশ, অবার ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া। কী আশ্চর্য, এইমাত্র ওই থলিটাকে নিয়ে যেন একটা আস্ত ছবি দেখলেন চারুলতা। প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী। অথচ এই ক'দিন ধরে শুধু ভেবে চলেছেন চারুলতা, আচ্ছা এই যে দীর্ঘকাল দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়ে এলেন অবিচ্ছিন্নভাবে।

অথচ কিছুতেই মনে পড়েছিল না এতোদিন ধরে কী করেছেন তাঁরা ? দিনে রাতে

কথার চাষ, অথচ স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ছে না কেন ? শুধু একটু ভঙ্গী, একটু একটু হাসি, একটু কথার টুকরো।

চল্লিশ বছর ধরে কত কথা কইলেন, পরপর সাজিয়ে ধরে রাখতে পারছেন না কেন ?

হ্যাঁ, ক'দিন ধরে অবিরত এই ভাবনাই ভেবে চলেছেন চারুলতা : কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলেছেন ?

কোনো একটু ভালো কথা ? ভালবাসার কথা ? কিছুতেই যেন মনে পড়ছে না !

অবিনাশের মনের প্রাণের কথা বলতে, ইদানীং ছিল শুধু ছেলে, ছেলের বৌয়ের ব্যবহারের সমালোচনা আর আক্ষেপ। কষ্ট হতো। তাই বলতে চাইতেন একটা প্রাণের মানুষের কাছে। কিন্তু চারুলতা ? চারুলতা কি এ চাওয়াকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কোনোদিন ? একদিনের জন্যও না।

চারুলতা বকে উঠেছেন, থামো তো। মেয়েলিপনা কোরো না। আজকাল তো এই রকমই হয়েছে। দ্যাখো না ঘরে ঘরে? তোমার গিন্নীর আমলটা আছে এখন? তাই সেইরকম আচার আচরণ প্রত্যাশা করবে ?

অথচ চারুলতার মধ্যেও তো সেই একই অভিমান অভিযোগ পাক খেতো। প্রকাশ করতেন না। স্বীকার করতেন না। রেগে যেতেন অবিনাশ, বলতেন, তোমার প্রশ্রয়েই আরো আসপদ্দা বাড়ছে।

চারুলতা দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিতেন। কারণ চারুলতা এগুলোকে খেলোমি মনে করতেন। প্রতিবাদ করতে গেলে ধৃষ্টতা হবে বুঝতেন। তবু একবারও কী বলে ওঠা যেত না, সত্যি ! আমিও তো বুঝছি হাড়ে হাড়ে।

নাঃ। বলেন নি কোনোদিন। ইদানীং তাই ভারী মনমরা হয়ে গিয়েছিলো মানুষটা ! ভাবতেন তাঁর কোনো দরদী নেই। বিশেষ করে শেষের এই দেড় দু'মাস। তাতাইকে নিয়ে চলে যাবার পর।

ভাঙ্গা-চোরা সেই মানুষটার কাছে গিয়ে এ কথাও তো বলতে পারতেন চারুলতা অত মন খারাপ করছো কেন ? ধরে নাও না খোকা বিলেত আমেরিকায় বদলী হয়ে গেছে। আজকাল তো হামেশাই এই দৃশ্য ! তবে ? আমরা তো আছি দুজনে একসঙ্গে !

নাঃ। এমন অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে কথা বলা ঠিক অভ্যাস ছিল না চারুলতার। এখন মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও, একটা কোনো ক্ষণ কি ফিরিয়ে আনা যাবে ?

মনোজ এসে দাঁড়াল।

একা !

হ্যাঁ, অন্যকোনো সময় অমিতা স্বামীকে একা কোথাও না ছাড়লেও গোলমেলে সময়ে ছাড়ে।

কী বলা হবে মাকে ?

এই বাড়িটা তো ছেড়ে দিতেই হবে। শুধু মাকেএকা রেখে যাওয়া বলেই নয় (অমিতা বলেছে বিনা পয়সায় থাকার লোভ দেখালে তোমার আপনজনেরা কেউ এসে থাকতেও পারেন) কিন্তু মাস-মাস এতোগুলো টাকা ভাড়াটা জোগাতে হবে না ? যতই আগের ভাড়া হোক মাসে দেড়শোখানি টাকা তো দিতেই হয়। তবে ?

অতএব ?

অতএব এখন চারুলতাকেই নিয়ে যেতে হবে সংসার উঠিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে, বেহালার সেই 'শান্তিনিবাস'। যেখানে বাড়ির থেকেও আরাম আয়েস, নিশ্চিন্ততা। ভালো ঘরে থাকা, ভালো খাওয়া দাওয়া, টি. ভি-তে দেখা আছে।

করতেই হবে সেটা।

অমিতা জোর দিয়ে বলেছে, আধুনিক জগতে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো 'মানব না' বললে চলবে কেন ? ওগুলো খুলেছে কেন ? চলছে কি জন্যে ?

মনোজ এল।প্রথমেই অস্বস্তি এড়াতে তাতাইয়ের প্রসঙ্গ তুলল।

তাতাই কী করে বেড়াচ্ছে বল তো মা ? তোমার কাছ থেকে একটা ভালো থলি নিয়ে কী যে পুরছে তার মধ্যে ! জিগ্যেস করতে গেলাম তেড়ে মারতে এলো।

চারুলতা আলগা ভাবে বললেন, কী পুরছে ?

মনোজ সহজ কথার স্রোতে ভাসতে ভাসতেই বোধহয় কূলে পৌঁছতে চাইছে। তাই তাড়াতাড়ি বলে—

কী পুরছে সে ও জানে, আর ওর ভগবান জানে। সারা বাড়িতে, ছাত থেকে নীচে পর্যন্ত কী যে ওর রাজ-ঐশ্বর্য ছড়ানো ছিল। খুঁজে খুঁজে বার করছে, আর থলেয় ফেলছে। ওর মা বুঝি বলেছিল, রাস্তার কাগজ-কুড়ানিদের মতো, ও কী হচ্ছে ? যত সব ভাঙা-চোরা ফাটা ফুটো মাল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিস ? তো মাকে তো এই মারে কি সেই মারে। আবার কী শাসন, 'কক্ষণো আমার এ সব দেখবে না বলছি।' তা' অমিতা কোনো সময় দেখে নিয়েছে। বলেছে, নতুন খেলনার অভাব ওর ! তাই কোথা থেকে না কোথা থেকে কোন্ কালের কল ভাঙা মটরগাড়ি, ডানা ভাঙা এরোপ্লেন, মুখ ভাঙা ডটপেন, ফুটো হয়ে যাওয়া রবারের বল, এইসব জড়ো করছে নিয়ে যাবার জন্যে। তো দেখেছি বললে তো মাকে আস্ত রাখবে না।

চারুলতা আস্তে বললেন, তা না দেখলেই হতো। শিশুর কাছে বিশ্বাসভঙ্গ করতে নেই। কী ভেবে যে কী করে ওরা।

আর কিছুই না। সম্পত্তি গোছানো হচ্ছে আর কী।

নিজেকে আলগা করে ভাসিয়ে দেয় মনোজ নামের অসহায় জীবটা।

তা' নাতির তো মালপত্তর গোছানো হলো ; এখন নাতির ঠাকুমার ব্যাপারটার কী হয় বল তো ?

চারুলতাও ছেলের মতোই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া গলায় বললেন, কিসের কী হয় ?

এই যে এখানের এই বিশাল মালপত্তর, এর সিকিও তো সেই ফ্ল্যাট বাড়িতে ধরবে না !

চারুলতা শান্ত গলায় বলেন, তোদের ঘরের সব কিছু নিয়ে যাচ্ছিস তো বৌমার বাবার দেওয়া খাট আলমারী আলনা আয়না টেবিল—

তা সেগুলো আর না নিয়ে গিয়ে উপায় কী ? লাগবেও তো।

সে তো সত্যি। লাগবে তো সবই।

তবে আমার এদিকের ডেয়ো ঢাকনা, আবোলতাবোল, যেমন আছে থাকগে। একে একে ধ্বংস হবে ! ও তো আর তোদের কাজে লাগবে না।

মনোজ ভুরু কুঁচকে বলে, একে একে ধ্বংস হবে ? বাড়িওলাকে বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে না ?

চারুলতা বলেন, আরে ! বিনোদবাবু তোকে কিছু বলে নি ?

কী বলবে ? বিনোদবাবুর সঙ্গে তো আমার দেখাই হয় নি।

তা বটে ও তো সদাব্যস্ত মানুষ। কথা যা বলেছে, গিন্নীই বলেছে। ওর মেজমেয়ে লবঙ্গ, মনে আছে ছেলেবেলায় যাকে তুই ক্ষ্যাপাতিস, 'এই লবঙ্গ, আয় তোকে চিবিয়ে খাই।' তা তার বর নাকি কলকাতায় বদলী হয়ে এসে বাড়ি পাবে না, তাই গিন্নী বললো, ভগবানের ইচ্ছেয় মনোজের যখন নিজের বাড়ি হয়েছে, তো লবঙ্গরা এসে ওই রাস্তার ধারের পোরশনটায় থাকুক, আপনি আপনার এদিকে যেমন আছেন থাকুন। লবঙ্গর মাথার ওপর ছাতা, আপনি থাকবেন গার্জেন হয়ে।

মনোজ কি তার ভগবানকে উথলে উঠে ধন্যবাদ দেবে ? নাকি অপমানিত হয়ে রাগ দেখাবে ?

তা দুটোই করে মনোজ। গোড়ারটা মনে মনে, আর শেষেরটা মুখে।

ওঃ। তলে তলে এতোসব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ? তা আমাদের একটু জানালে পারতে !

চারুলতা হঠাৎ একটু কঠিন স্বরে বলেন, আমি কোনো ব্যবস্থাই করিনি খোকা। তলে তলে ব্যবস্থা করার যিনি মালিক তিনিই করে চলেছেন। তা এ তো খুব

বিবেচনার কাজই করেছেন। সকলের অনুকূলে যায়, এমন ঘটনা তো বড় সচরাচর ঘটে না।

চারুলতা এখন আবার নরম গলায় আস্তে বললেন, যিনিই ফেলেন তিনিই তোলেন।

মনোজ আর কথা বাড়াতে ভরসা পেল না। চলে যায় কর্ণধারের কাছে।

ওর চলে যাওয়ার বিপর্যস্ত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দেখেন চারুলতা। একটা নিঃশ্বাস ফেলেন। ছেলেটার জন্যে বড় দুঃখ হয়।

দিদা!

তাতাই আবার এসে দাঁড়ায়।

স্কুলের বই নেওয়ার ভঙ্গীতে কাঁধে সেই থলিটা। এইটা তোমার ঘরে লুকিয়ে রেখে দাও তো! ও ঘরে রাখলে মাম্মী পাজীটা ঠিক চুপিচুপি দেখে নেবে।

তাতাইয়ের মুখের মধ্যে একটা আঙুল।

আর একটা গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস পড়ে চারুলতার। ছেলেকে খুব বেশী ভাল করে মানুষ করে তুলছে এরা! আরো ভালো করে মানুষ করার জন্য চারুলতার সংসর্গ থেকে সরিয়ে নিতে এতো তোড়জোড় এত কাঠ-খড় পোড়ানো। চারুলতার খোকা কখনো এমন কথা উচ্চারণ করতে পারতো? না কি ভাবতেই পারতো?

আস্তে বললেন, আচ্ছা! আমি ভীষণভাবে লুকিয়ে রাখবো।

নিয়ে নেন তাতাইয়ের হাত থেকে।

আলমারী খুলে কাপড় চোপড় সরিয়ে ঠেলে রেখে দেন সেই নানা বস্তুতে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে ওঠা থলিটাকে। তাতাইয়ের মুখে আলোর ঝিলিক। তবু বলল, আলমারিতে পুরছ? এসব নোংরা না?

ওমা! সে কী? তোমার দরকারি দরকারি জিনিসপত্র আবার নোংরা হতে পারে?

ঝিলিকটা এবার ঝলক হয়ে ওঠে। মুখে আঙুল দিয়েই বলে তাতাই, তুমি যে বলতে বড়, নোংরা বড্ড নোংরা, ময়দায় ঠেকবে, কুটনোয় ঠেকবে!

আহা সে তো ময়দা, কুটনো। আলমারীর মধ্যে ওসব আছে?

আহা! চাবি বন্ধ করে দাও।

এই তো দিলাম।

চাবিটা লুকিয়ে রেখো, বাপী মাম্মী যেন দেখতে না পায়

ওরা আমার ঘরে আসে?

হ্যাঁ! আচ্ছা!

গোল গোল পা ফেলে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। সন্দেহের গলায় বলে, তুমি ভুলে ভুলে দেখে ফেলবে না তো?

পাগল!

হৃষ্টমুখে চলে যায়।

যিনি 'ফেলেন' এবং 'তোলেন' তিনি যে হঠাৎ এতই বিচক্ষণ হয়ে উঠবেন, এটা ধারণাতীত।

অমিতার মা বললেন, এ শুধু 'সন্তোষী মার' দয়া। আগে বড়দির ব্যাপারে হাসতাম, এই তো বাবা প্রত্যক্ষ দেখলাম! তা মানতে হবে 'প্রত্যক্ষ'। তবু সমস্যার যখন এতো সুন্দর সমাধান ঘটে গেল, তখন অনায়াসেই সৌজন্য করা যায় প্রাণখুলে। এবং সেই সুরটা বজায় রাখতে আহত উত্তেজিত ভঙ্গীতে এসে বলা যায়, মা, আপনি নাকি আমাদের সঙ্গে ও বাড়ি আসছেন না?

চারুলতা একটু হেসে বললেন, তোমাদের সঙ্গেই তো সর্বদা আছি বৌমা। তবে বলতে পারো শরীরটাকে এখানেই ফেলে রাখছি।

ও তো একটা ইয়ে কথা। আমরা আপনজনরা থাকতে আপনি পরের ভরসায় পড়ে থাকবেন? ওই লবঙ্গ না কে—

কথাটা কিন্তু উল্টো বৌমা। আমি লবঙ্গর ভরসায় থাকতে বসি নি, লবঙ্গই বরং আমার ভরসায়—ওর মা আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে যাবেন না মাসিমা, আমি বরাবর জানি, এ আপনারই বাড়ি।

ওঃ! অমিতা আসল কথায় আসে, তা' ভাড়ার ব্যবস্থা কী হলো?

আর বোলো না মা! বলে ভাড়া আপনাকে দিতে হবে না, একখানা ঘর নিয়ে থাকবেন বৈ তো নয়। তো সেটা অবিশ্যি কাজের কথা নয়। দেব কিছু! তা সে আমার থেকেই কুলিয়ে যাবে।

'চারুলতার থেকে' কথাটার মানে 'বিধবা পেনসন' না কি যেন পাবেন তিনি অবিনাশের অফিস থেকে।

কথাটা বলেই তাড়াতাড়ি সামলান চারুলতা, আসলে এতো অনুনয় বিনয় করছে! 'না' করা গেল না। ওদেরও তো একটা মস্ত উপকার। কাচ্চা-বাচ্চার মা, বরের না কি কেবলই ট্যুরে যেতে হয়। একটা পাহারাদার রইল আর কি!—হাসলেন একটু।

পাহারাদার! অমিতা ভুরু কোঁচকালো।

অন্য একজন মুফতে একটা পাহারাদার পেয়ে যাবে! এওতো বিরক্তিকর। সেই

পাহারাদারটা যখন নিজের সম্পত্তি। সেই বিরক্তিটাই প্রকাশ করে অমিতার মুখ-চোখ, কণ্ঠস্বর। (হুঁ! স্বার্থ! ষোলোআনা স্বার্থ। তাই উদারতা, 'ভাড়া দিতে হবে না'।) যাক অসুবিধে হলেই চলে আসবেন। দ্বিধা করবেন না।

তাতাই যে কখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বসে আছে কে জানে। বীরবিক্রমে বলে ওঠে, বলেছিনা, দিদা কখনো নতুন বাড়িতে যাবে না। এইখানেথাকবে। চিরকাল থাকবে।

ওঃ তাতাই! এতো অসভ্য হয়ে যাচ্ছ কেন তুমি? দেখতে পাচ্ছো তোমার এই রকম অসভ্য কথার জন্যে দিদা রাগ করে যেতে চাইছেন না।

আহা কী যে বল বৌমা! ছেলেমানুষ, কী ভেবে কী বলে। ওকথা বলে ওর মনে কষ্ট দিও না!

মাম্মীর কথায় মনে কষ্ট হতে আমার বয়ে গেছে।

তাতাই বীরদর্পে বলে, মাম্মী তো মনে কষ্ট দেওয়ার রাজা। বাপীকে মনে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তো মেরে ফেলে একেবারে।

চলে যায় তার সেই ধপধপে গোলানো গোলানো পা ফেলে।

আচ্ছা! ঠিক আছে। অমিতার দিন আসছে। কী করে ওই বেয়াড়া বনে যাওয়া ছেলেকে শায়েস্তা করতে হয়, তা দেখিয়ে দেবে!

অবশেষে সেই দিনটি আসে।

এতো হিজিবিজির পর আর 'গৃহপ্রবেশের' ঘটার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া মূল প্রবেশকারীর ন্যাড়া মাথায় সম্যক চুল না গজানো পর্যন্ত, পাঁচজনকে ডাকার কথা ভাবা যায় না কি?

তবু একটা শুভদিন দেখে যাওয়া!

অনেক অপেক্ষান্তে সেই শুভদিন এলো।

যাত্রাকালে অমিতার বাবা এলেন।

নিজের গাড়িটা করে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। মা তো আসবেনই।

অমিতার মা বেয়ানকে বললেন, বুঝতেই পারছি, আপনার ঠাকুর দেবতা শুচিবাই-টুচিবাইয়ের ব্যাপার ওদের ওখানে অসুবিধে হবে ভেবেই এমন একটা অদ্ভুত ডিসিশান নিলেন বেয়ান! মিতু খুবই মর্মাহত হয়েছে।

চারুলতা আস্তে বললেন, তা' নয় ভাই। বাড়িটায় অনেক স্মৃতি জড়ানো!

হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক।

বেয়ানের স্বর সহৃদয়। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলার কিছুই নেই! ওরে মিতু

আর দেরী করিস না। তোর বাপীর তো আবার সেই 'মাহেন্দ্রক্ষণ', 'অমৃত যোগ' অনেক প্রেজুডিস !

চারুলতা বললেন, খোকা, তোরা দুজনে নতুন কাপড় পরেছিস ?

হুঁ। তো আয়, ছেলে নিয়ে এখানে এসে তিনজনে ঘট প্রণাম করে যা।

ছেলে নিয়ে।

আরে তাই তো। ছেলেটা কোথায় ?

ওমা সে কি ! খোঁজ খোঁজ। হৈচৈ পড়ে যায়। নাঃ। ভয়ের কিছু না। ছাতে একটা ঘুড়ি কেটে পড়েছে দেখে নিতে ছুটেছিল। ঘুড়িটা ছাতে পড়ে থাকবে ? এ হয় নাকি ?

এসে বলল, ঘটি আবার প্রণাম করব কী ? হি হি, ঘট একটা মানুষ নাকি ?

বেশ বাবা করিস না।

ও বাড়ির দিদিভাই বলে ওঠেন, তা অ মিতু ! এখন এই যাত্রার সময় একটা কাটা ঘুড়ি হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠবে তাতাই ?

তাতাই ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তোমায় বলেছে—ঘুড়ি নিয়ে উঠবে। সব সময় সর্দারী ! দিদা, তুমি এই ঘুড়িটা এক্ষুণি তোমার ঘরে উচ্চু আলমারীর মাথায় তুলে রাখ তো।

আমার ঘরে !

চারুলতা বিমূঢ়ভাবে বলেন, বেশ। ঘরে ঢুকে যান ঘুড়ি হাতে।...আর পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তাতাইয়ের সেই মালপত্রের ঝোলাটি হাতে নিয়ে। বলে ওঠেন, আরে দাদুসোনা, তোমার দরকারি দরকারি জিনিসপত্তর যে পড়ে থাকছে। এই নাও।

অমিতার বাপী অস্থির গলায় বলেন, উঃ অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওসব এখন থাক থাক।

থাকবেই তো—

তাতাই দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, দিদা ! এটা এখন তোমায় কে বার করতে বলেছে শুনি ? এখন নেব বলেছি ?

তারপর ঘুরে দাঁড়াবার আগে একটি অমোঘগলায় বলে ওঠে, চিরকার এখানে থাকবে। যখন বাপীর মতো বড় হবো, যখন আমি আমার বৌকে নিয়ে, মাম্মীকে 'কলা কলা' করে এখানে চলে আসবো, তখন নেবো। ঘুড়িটাও নেবো তখন। হারিয়ে ফেলো না !—চলে যায় গটগটিয়ে মা বাপের আগে আগে।